নীললোহিতের চোখের সামনে

শীলা ও অশোক গঙ্গোপাধ্যায়কে

১

পাঁচটি সুস্থ সবল শহুরে যুবক চিড়িয়াখানায় গেছে কেন? চিড়িয়াখানায় ওরা কী দেখবে? পাঁচটি ছেলে হঠাৎ এক বিকেলবেলা ঠিক করে ফেলল, 'চল চিড়িয়াখানায় জন্তুজানোয়ার দেখে আসি'—এটা আমার কীরকম অবিশ্বাস্য মনে হয়। যুবকরা বিকেলবেলা যাবে খেলার মাঠে কিংবা সিনেমায় লাইন দেবে কিংবা রাস্তার মোড়ে দাড়িয়ে গুলতানি করবে—মেয়েদের দেখলে এক চোখ বন্ধ করবে বা শিস দেবে কিংবা রাজনৈতিক মিছিলে যোগ দিয়ে তেজী শ্লোগান দেবে কিংবা অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মারামারি-পটকাবাজি করবে—এগুলোই স্বাভাবিক।

জন্তুজানোয়ার সম্পর্কে যদি শখ থাকেই তাহলে সকালবেলা কুকুরের গলায় চেন বেঁধে বেড়াতে বেরুবে অথবা বন্দুক নিয়ে জঙ্গলে যাবে শিকার করতে। কিন্তু চিড়িয়াখানায় জানোযার দেখতে যাবে কেন? অবশ্য চিড়িযাখানায় কতরকম জানোয়ার আছে আমি জানিনা।

চিড়িয়াখানায় সাধারণত যায় কারা? অধিকাংশই কলকাতার বাইরেব লোক। কলকাতার দ্রষ্টব্য জায়গাগুলোতে কলকাতার লোক সাধারণত যায়না। গ্রাম থেকে, অন্য প্রদেশ থেকে লোকেরা কলকাতায় বেড়াতে এলে চিড়িয়াখানায় যাবেই। কলকাতার লোকও যায়, রবিবাব বা ছুটির দিন সপরিবারে, তিন-চারটে বাচ্চা থাকবেই— এবং সবই ঐ-বাচ্চাদের জন্যই। শিশুদের বিস্ময় বড়রা উপভোগ করে। আরও কেউ-কেউ যায়, বিশেষত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা, খাবারদাবার ও পানীয় সঙ্গে নিয়ে চিড়িয়াখানার সুন্দর মাঠে পিকনিক করে।

যুবক-যুবতীরাও যায়, কিন্তু তারা একা নয়, এবং একসঙ্গে দুজনের বেশি নয়। পাখি কিংবা পশু দেখার দিকে তাদের বেশি ঝোঁক নেই, সাদা বাঘ দেখার জন্য তারা লাইনে দাঁড়ায়না, তারা অলস পায়ে ঘুরে-ঘুরে খোঁজে একটি নিরিবিলি বসার জায়গা। সেবকম জায়গা পাওয়াও যায়, মাঠে অপূর্ব ফুলেব শোভা, জলের ধারে গাছের ছায়া, ছিমছাম বেঞ্চ। কখনো ভেসে আসে সিংহগর্জন, হস্তির বৃংহিত। একসঙ্গে হাজার পাখির ডাক—আর ওরা দুজন সম্পূর্ণ আলাদা ভাষায় ফিসফিস করে কথা বলে।

এদের সবাইকেই চিড়িয়াখানায় মানায়, কিন্তু ঐ পাঁচজন যুবক কেন? ওরা কি ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানা দেখেনি? যৌবনে এই পশুপ্রীতি কেন? অবশ্য

আড়ালে দুজন বসে আছে, তাদের ব্যাঘাত ঘটাতে চাইনি। হঠাৎ কানে এসেছিল সেই ঝোপ থেকে মেয়েলি কণ্ঠস্বর, 'আঃ হচ্ছে কী, ছাড়ো ছাড়ো, ইস, না আর কোনোদিন আসবনা, জানোযার কোথাকার।' মেয়েটি চিড়িযাখানায় বসে কোন জানোয়ারের কথা বলেছিল, আমার দেখা হযনি।

সেই যুবক পাঁচজনও বিশেষ কোন খাঁচার সামনে ব্যগ্র হয়ে দাঁড়াচ্ছেনা। তারাও ঘুরছে হালকা পায়ে। পাঁচজনই পরেছে সরু প্যান্ট, চক্রাবক্রা জামা, অতি-কাযদায় আঁচড়ানো চুল। সন্ধানী চোখে ঝোপে-ঝাড়ে নিরালা বেঞ্চে উঁকি মারছে। দৈবাৎ কোন ছেলেমেযে পাশাপাশি দেখলেই জমে যাচ্ছে তারা। বোঝা গেল, তারা পশুপাখি দেখতে আসেনি, এমনকি মেযে দেখতেও আসেনি,—এসেছে এত দূরে পয়সা খরচ করে অন্যদের জ্বালাতন করতে। ওদের নিজেদের কোন মেযে-সঙ্গী নেই, সুতরাং অন্যদের ওরা শান্তিতে থাকতে দেবেনা।

ওদের ভাষা খুব চেনা। ঘনিষ্ঠ হযে বসে-থাকা ছেলেমেযেদুটির একেবারে কাছে গিয়ে ঘিরে দাঁড়িযে বলবে, 'এই যে, অ্যা, কলেজ পালিযে এইসব। মাকে বলে দেব।'. 'পিরীতি কাঁটালের আটা, লাগলে পরে...', 'মাইরি, মেযেটার মুখে কিরকম লপচু-লপচু ভাব দেখছিস।' 'আরে শালা, আবার পদ্যের বই এনেছে, পদ্য শোনানো হচ্ছিল।' ইত্যাদি।

ছেলেটি-মেযেটি কিছুক্ষণ আডষ্ট হযে বসে থাকে, তারপর সুড-সুড করে উঠে যায, একটু দূরে গিযেই দ্রুত পা চালায। পাঁচটা চেঙা প্যান্ট-পরা ছেলের ব্যবহারের প্রতিবাদ করবে, এমন সাহস ওদের নেই। ওরা পৃথিবী উল্টে দিতে পারে। ছেলেমেযেদুটি উঠে পালিযে গেলে ওরা সাফল্যে অট্টহাসি হাসে।

তবে, ওরকম নিভৃতে বসে থাকা ছেলেমেযে ওরা বেশি পাচ্ছিলনা। তিন-চার জাযগায় হানা দিযেই স্টক শেষ। কিন্তু ওরা আট আনার টিকিট কেটে ঢুকেছে, ওদের পযসা উসুল হচ্ছিলনা। ঘুরতে ঘুরতে ওরা একটা বড দলের সামনে এসে পড়ল।

পাখির ঘরের সামনে শতরঞ্চি বিছিযে বসেছে একটি দল, প্রায পঁচিশ-তিরিশ জন, অর্ধেক-অর্ধেক ছেলেমেযে। সম্ভবত কোন ক্লাব, তারা সঙ্গে খাবার এনেছে, হার্মোনিয়ম তবলা ও গানের খাতা এনেছে। স্বাস্থ্য ও প্রাণসম্পদে ভরা ছেলেমেযে, অনাবিল হাসি ও আনন্দ করতে জানে। তারা কেউ কারুকে নিযে আলাদা হযে যাচ্ছেনা, কেউ গদগদ নয, রসিকতার জন্য খারাপ ভাষা ব্যবহার করার দরকার হচ্ছেনা।

সেই পাঁচজন যুবক একটু দূরে পা ফাঁক করে দাঁড়াল। ঐ-দলের মেয়েগুলোর মুখের ওপর তীব্র দৃষ্টি বুলিয়ে ওরা অবস্থাটা যাচাই করার চেষ্টা করতে লাগল। ওরা যেন সুনীতিরক্ষক পুলিশ। কোথাও ছেলে আর মেয়েরা একসঙ্গে বসেছে, এটা ওরা সহ্য করবে না। এখানেও ওরা আওয়াজ দেওয়া শুরু করবে কিনা, সেটা ঠিক করতে একটু সময় নিল। ঐ-দলে প্রায় পনেরো-ষোলোজন ছেলে আছে, যদিও কালচার-মার্কা ক্যাবলাকান্ত ছেলে সব, ধুতি-ফুতি পরা ল্যাজে-গোবরে, এদের শালা রুখে ওঠার ধক নেই, তবু যদি ওঠে, পনেরোজন তো, দেখা যাক।

ওদের দলের অনুষ্ঠান এবার আরম্ভ হবে। শীত শেষ হয়ে এসেছে, মেঘ নেই, টকটকে নীল আকাশ, রঙিন ফুলে চিড়িয়াখানার মাঠটা রঙের সমুদ্র, দুর্লভ সব পাখির ঘরের সামনে ওরা আনন্দ করতে এসেছে। গোল হয়ে বসেছে, কয়েকটা ফ্লাস্ক থেকে বেরুল কফি, কাগজের গেলাসে ঢালা হতে লাগল, একজন বলল, 'আগেই খাওয়া-দাওয়া? আগে গান শুরু হোক!' আরেকজন বলল, 'কফি খেতে-খেতে গান।' আরেকজন বলল, 'এই মন্দিরা সেই যে ফুলগুলো এনে-ছিলে?' মন্দিরা বলল, 'ও হ্যা, সেগুলো তো দেওয়া হয়নি!'

এরা পাঁচজন একটু দূরে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এতগুলো মেয়ে দেখেও ওরা এখনও আওয়াজ দিতে পারছেনা, এইজন্যে বেশ অস্বস্তি। একজন ফিসফিস করে বলল, 'ফিস্টির নামে ফষ্টিনষ্টি করতে এসেছে শালারা।' আর একজন বলল, 'এসব পাবলিকের জায়গায় ওসব বেলেল্লাপনা, মামদোবাজি নাকি?' আরেকজন, 'দেব শালাদের ধুনে?'

সেই দলটায় গান শুরু হবার আগে একটি মেয়ে উঠে সবাইকে একটা-একটা করে গোলাপ ফুল দিল। লাল গোলাপ, তাজা। মেয়েটির হাতে অনেক গোলাপ ছিল, সবাইকে দিয়েও ফুরোলনা, হাতে অনেক রয়ে গেল। মেয়েটি খুব ছটফটে হাসিখুশি খোলামেলা ধরনের। ফুলগুলো নিয়ে সে এদিক-ওদিক তাকাল। বেশ কয়েকটা বাচ্চা ছেলেমেয়েও ওদের দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছে, মেয়েটি তাদেরও একটি করে ফুল দিল। দিতে-দিতে সে সেই পাঁচজন যুবকের সামনে এল, দ্বিধা করলনা, বলল, 'আপনারা ফুল নেবেন? নিন-না।'

সেই পাঁচজন জবরদস্ত মস্তান একটু অপ্রস্তুত। লজ্জায় তারা শরীর বেঁকাতে লাগল। মেয়েটি টপাটপ তাদের হাতে একটা করে গোলাপ দিয়ে ফিরে গেল নিজের দলে। সেই পাঁচজন ফুল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতন, পরস্পর মুখ তাকাতাকি করতে লাগল।

গান শুরু হয়ে কিছুক্ষণ চলার পর ওরা তখনও দাড়িয়ে। যে-মেয়েটি ফুল

দিয়েছিল, ওরা পাঁচজন তাকেই একদৃষ্টে দেখছে। সেই দল থেকে আরেকটি ছেলে উঠে এসে ঐ পাঁচজনকে বলল, 'আপনারা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আসুন-না আমাদের সঙ্গে বসবেন।'

এরা অতিশয় ভদ্র হয়ে বলল, 'না, না—।'

সেই ছেলেটি বলল, 'কেন আসুন-না, অনেক জায়গা আছে।'

পায়-পায় এগিয়ে এসে এরা বসল ধারের দিকে। চোঙা প্যান্ট, পা মুড়ে বসতে অসুবিধে হয়, বসেছে এঁকেবেঁকে, আনস্মার্টভাবে, হাতে ফুল। ওরা কোরাস গাইছে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। তারপর একজন এদের জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা গান জানেননা? একটা গান শোনান-না।'

এবা সমস্বরে বলল, 'না-না আমরা গান জানিনা!'

—সে কি, কোন গান জানেননা?

—না।

আসলে ওরা পাঁচজনেই অনেক সিনেমার গান দু-তিন লাইন করে জানে। কিন্তু এরকম জায়গায় বসে কখনো গান করেনি, তাই সাহস পেলনা।

—ঠিক আছে আমাদের সঙ্গে কোরাসে গলা মেলান!

—কী গান?

—আলোকের এই ঝর্না ধাবায় ধুইয়ে দাও।

ওরা এ-গান জানেনা। তাদের সবাই যখন প্রাণখুলে একসঙ্গে গাইতে লাগল, এবা পাঁচজন শুধু বসে বইল চুপ করে। পরস্পরের মুখের দিকে দেখছে মাঝে-মাঝে। অবিলম্বেই ওদেব কথা আর-সবাই ভুলে গেল। আপনমনে গান গাইছে তারা। এরা পাঁচজন একটু বাদেই উঠে পড়ল, কারুব কাছ থেকে বিদায় না-নিয়েই চুপচাপ চলে গেল।

বেশ-কিছুটা দূরে গিয়ে ওরা একসঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ল। একজন বলল, 'যাঃ শালা কী ন্যাকামি মাইবি!'

আরেকজন বলল, 'মেয়েটা বেশ দেখতে ছিল, ওকে পেলে কলজেটা বাঁধা দিতাম।'

আরেকজন হাতের গোলাপ ফুলটা মাটিতে ছুঁড়ে বলল, 'ধ্যুৎ যত মেয়েলিপনা।'

আরেকজন ফুলের পাপড়িগুলো ছিঁড়তে লাগল নিঃশব্দে।

আরেকজন ফুলটা গোপনে পকেটে বেখে বিমর্ষভাবে বলল, 'আজ আর কিছু ভালো লাগছেনা, চল বাড়ি যাই।'

আমার মেজোকাকার ছেলের বিয়ে, নেমন্তন্নবাড়িতে সে কী কেলেঙ্কারি কাণ্ড!

মেজোকাকা টালিগঞ্জে নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন এবং তাঁর বড় ছেলের বিয়ে, সুতরাং বেশ ধুমধামের ব্যাপার। দিল্লি আর পাটনা আর গৌহাটি থেকে পর্যন্ত আত্মীয়স্বজন এসেছেন, গম্‌গম্‌ করছে সারা বাড়ি, আমি কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে অকারণে ব্যস্ত হয়ে খুব কাজ দেখাচ্ছি। গৌহাটির পিসেমশাই চা বাগানের ম্যানেজার—মানুষকে হুকুম করা তাঁর অভ্যাস—সুতরাং যখন-তখন ভরাট গলায় যাকে-তাকে হুকুম করে কর্তৃত্ব দেখাচ্ছেন, মেয়েরা শাড়ি-গয়নার আলোচনায় মুখের ফেনা তুলে ফেলেছে, মেজোকাকা মাংসওয়ালাকে খুব কচি নয় অথচ চর্বি থাকবেনা—এমন পাঁঠার কথা বোঝাচ্ছেন, কুটুমবাড়ির দেওয়া জিনিশপত্রের মাঝখানে মেজোকাকিমা নৈবেদ্যর ওপরে কিসমিসটির মতন বসে আছেন, এইসময় কাণ্ডটা ঘটল।

ছাদে দই-মিষ্টি তৈরি হচ্ছে—আমি তার তদারকি করছিলাম, বিকু এসে চুপি-চুপি আমাকে বলল, 'নীলুদা, তুমি ছাড়া আর-কেউ পারবেনা, তাই তোমাকেই বলতে এলাম, তুমি যদি একটু চেষ্টা করো, মানে ইয়ে...।' আমি হাসতে-হাসতে বললাম—'লজ্জা কী বাবাজীবন, বলেই ফেলো! কিন্তু আজ তো দেখা হবেনা, আজ কালরাত্রি!' বিকু বলল, 'না না, তা নয়, ওর শরীরটা ভালো নেই—'

আমি সরলভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওর মানে কার?'

বিকু বলল, 'ঐ-যে তোমার ইয়ের, মানে শরীরটা ভালো নেই, তাই বলছিলাম কী, মেয়েরা যদি আচার-টাচার খানিকটা কমিয়ে একটু তাড়াতাড়ি শুইয়ে দেয় ওকে—'

এরপর বিকুর সঙ্গে খানিকটা ঠাট্টা-ইয়ারকি করে আমি ওর অনুরোধ ঠেলতে না-পেরে নিচে নেমে এলাম, যদি হিংস্র কৌতূহলী মেয়েদের সরিয়ে নতুন বউয়ের একটু বিশ্রামের ব্যবস্থা করা যায়। ভাগ্যিস এসেছিলাম, তাই আমি সেই কাণ্ডটার সাক্ষী হতে পারলাম।

উৎসববাড়ি সরগরম করে রেখেছিল আর-একজন, বড়কাকার মেয়ে কাজলদির ছেলে রিন্টু। বয়েস মাত্র চার বছর, কিন্তু সে একাই একশোজনের সমান। ফুটফুটে ফর্সা রং, কোঁকড়া চুল, দেবশিশুর মতন কান্তি, কিন্তু আসলে একটি এক নম্বরের বিচ্ছু। কখনো সে ছাদে, কখনো সে একতলায়, কখনো রান্নাঘরে—সব জায়গায় রিন্টু, জরুরি সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে রিন্টু এসে গণ্ডগোল উৎপাত শুরু করবে। সব উৎসববাড়িতেই বোধহয় ঐরকমের এক-একটি বিচ্ছু

থাকে। কিন্তু রিন্টুকে বকুনি দেবার উপায় নেই—বড়কাকার সে আদরের নাতি —ওকে শুধু ধমকালেই কাজলদির মুখ ভার।

ছাদ থেকে নেমে এসে আমি নতুন বউ যে-ঘরে বসে আছে সেইদিকে যাচ্ছিলাম, রিন্টু আমার জামা টেনে ধরে জিজ্ঞেস করল, 'নীলুমামা, ঐ-ঘরে ঐ-বস্তাটায় কী আছে?' সারাদিন ধরে রিন্টুর মুখে ওটা কী, কেন, ওটা কোথায় —এতবার শুনতে হয় যে আর ধৈর্য থাকেনা—সুতরাং আমি উত্তর না-দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছিলাম, রিন্টু তবু আমার পিছন-পিছন আসতে-আসতে বলল, 'বলো-না, ঐ-বস্তাটায় কী আছে, বলো-না!' সিঁড়ির পাশে ভাঁড়ার ঘরে অনেককিছু কিনে রাখা হয়েছে—রিন্টু তারই একটা বস্তা দেখিয়ে জানবার বলছে, 'বলো-না, ওটায় কী আছে! বলো-না!' বাধ্য হয়েই সেই বস্তাটার দিকে এক পলক তাকিয়ে আমি রাগতভাবে উত্তর দিলাম, 'ওটায় চিনি রাখা আছে। যাও, এবার খেলতে যাও!'

রিন্টু আমার জামা ছেড়ে দিল, তারপর বেশ অভিমানী সুরে বলল, 'ওটার ওপরে হিসি করে দিয়েছি।'

—অ্যাঁ???

আমিও ঘুরে দাঁড়িয়েছি, মেজোকাকাও পাশ থেকে কথাটা শুনেছেন, দুজনে সমস্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'অ্যাঁ? কী বললি রিন্টু?'

রিন্টু বেশ সহজভাবেই, সবাইকে শুনিয়ে বলল, 'আমি ঐ চিনির বস্তার ওপর হিসি করে দিয়েছি। মাকে ডাকলাম, মা যে আসছিলনা—'

যেন একটা বোমা পড়েছে, এক মুহূর্তের জন্য সব চুপ। নতুন বউয়ের গয়নার ডিজাইন লক্ষ করছিলেন কাজলদি, তিনি যেন ভূত দেখবার মতন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রিন্টুর দিকে। সন্দেহ কী রিন্টুর জাঙ্গিয়া তখনও ভিজে, আমরা কয়েকজন ভাঁড়ার ঘরে ছুটে গেলাম, চিনির বস্তাটা ভিজে জবজব করছে—অনেকক্ষণ চেপে রেখেছিল তো রিন্টু, তাই বেশ অনেকখানি—

ব্ল্যাকমার্কেট থেকে সাড়েচারটাকা দরে কেনা ৫০ কিলো চিনি। মেজোকাকার মুখখানা গুড়ের মতন চটচটে হয়ে এল, তিনি ধপ করে বসে পড়ে বললেন, 'একী সব্বনেশে ব্যাপার, এখন পাওয়া যাবে কিনা আর, এতগুলো টাকা—ওফ!' মেজোকাকিমাও ছুটে এসেছিলেন, তিনি বুদ্ধিমতী, তিনি তাড়াতাড়ি বললেন, 'চেঁচিয়ে বাড়িশুদ্ধু লোককে শোনাচ্ছ কেন? চুপ করো-না, কী হয়েছে কী?'

পঞ্চাশ কিলো চিনির দাম দুশো পঁচিশ টাকা। সমস্যা, এক্ষুনি অতটা চিনি আবার জোগাড় করা যাবে কিনা। তাছাড়া অতগুলো টাকা বাজে খরচ। মেজোকাকা অসহায়ের মতন আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'এখন কী করি বলো তো নীলু —ওফ—'

মেজোকাকিমা বললেন, 'চুপ করো, সারা বাড়ি চেঁচিয়ে শোনাচ্ছ কেন?'

আমি মেজোকাকিমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললাম, 'হ্যাঁ মানে, ছোটছেলের ইয়ে তো খুব পাতলা হয় একটু বাদে উপে যাবে—কেউ টের পাবেনা।'

পিছন থেকে কে যেন বলল, 'হ্যাঁ, রিন্টু বলছে বলেই তো আমরা জানতে পারলাম, যদি না-বলত, কেউ হয়তো টেরও পেতামনা।'

মেজোকাকা বলে উঠলেন, 'না, না, না এখন লোকজন জানবেই—শেষে এত আয়োজনের পর ঐ সামান্য ব্যাপারের জন্য বদনাম হবে—'

দুম-দুম করে পা ফেলে কাজলদি ঘরে ঢুকে বললেন, 'কোথায় গেল সে-হতভাগা ছেলে? আমি আগেই বলেছিলাম, ও-ছেলে নিয়ে আমি সন্ধেবেলা এসে শুধু নেমন্তন্ন খেয়ে গেলেই হত, তা না—'

মেজোকাকা বললেন, 'না, না কাজল, তুই ওকে কিছু বলিসনা, ও অবোধ শিশু—'

কাজলদি বললেন, 'শোনো কাকা, চিনির দামটা আমি দিয়ে দেব, তুমি আবার আনিয়ে নাও।'

—সে কী কথা, তুই দাম দিবি কী? ছিঃ! সামান্য টাকা—

—মোটেই সামান্য নয়। ঐ-টাকার জন্যে আমি কারুর কথা শুনতে পারবনা। আমার ছেলে পাজি,—আমার ছেলে খারাপ, আমি শিক্ষা দিতে জানিনা—

কাজলদি অবস্থাটা আরও ঘোরালো করে ফেললেন। হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেন। তারপর রাগারাগি কান্নাকাটি আরও বাড়তে লাগল, আমি সেখান থেকে কেটে পড়লাম। ছাদে উঠে দেখি—ঠাকুররাও এ-খবর জেনে গেছে, তারা উনুনের সামনে বসে মুখ টিপে হাসাহাসি করছে। এত তাড়াতাড়ি কী করে খবর ছড়ায় কে জানে! আর ছাদের কোণে তিন-চারটে বাচ্চার সঙ্গে প্রবল বিক্রমে খেলায় মেতে আছে রিন্টু। তার কোন গ্লানি নেই। হঠাৎ আমার হাসি পেল।

জর্জ ওয়াশিংটনের গল্প শুনেছিলাম বাগানের ফুলগাছ কেটে ফেলে বাবার কাছে সেই কথা স্বীকার করেছিলেন, ছেলেবেলায় তার বাবা ফুলগাছের দুঃখ থেকেও ছেলের সাহস ও সত্যবাদিতায় বেশি খুশি হয়েছিলেন। আর সত্যবাদিতার জন্যই বোধহয় তিনি প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। দিব্যদৃষ্টিতে আমি রিন্টুকে দ্বিতীয় জর্জ ওয়াশিংটন হিশাবে দেখতে পেলাম। কী সরল মুখ করে রিন্টু তখন বলেছিল, আমি চিনির বস্তায় হিসি করেছি! আমাদের পরিবারের একজন পরে প্রেসিডেন্ট হবে এই সম্ভাবনার কথা জানতে পারায়—আজ রিন্টুকে নিয়ে আমাদের উৎসব করা উচিত। এর তুলনায় ৫০ কিলো চিনি কিংবা ২২৫টা টাকা তো কিছুইনা।

কিন্তু তার জের চলল অনেকক্ষণ। মেজোকাকা আবার টাকা খরচ করে চিনি

কিনতে প্রস্তুত, বদনামের ভয়ে। কাজলদির গোঁ—তিনিই ঐ-টাকাটা দেবেন—নইলে শ্বশুরবাড়িতে তার নিন্দে হবে। এর সঙ্গে যোগ দিলেন ছোটমামা। ছোটমামার কেমিস্ট্রিতে বিলিতি ডিগ্রি আছে। তিনি দাবি তুললেন আবার চিনি কিছুতেই কেনা চলবেনা। ব্যবসায়ীরা গোরুর হাড় পর্যন্ত ভেজাল দিচ্ছে, আর এ তো সামান্য বাচ্চা ছেলের হিসি। চিনি জ্বাল দিয়ে রসগোল্লার রস হবে—অতক্ষণ আগুনের জ্বালের পর কোন দোষই থাকবেনা! এতখানি চিনি নষ্ট হবে? দেশের এইজন্যই উন্নতি হচ্ছেনা—যতসব কুসংস্কার! আত্মীয়স্বজনের মধ্যে বাকি অনেকেরই দেখা গেল সাত পুরুষে কবে যেন কার ডায়াবিটিস ছিল—তারা তো মিষ্টি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিল—সুতরাং এতে তাদের কিছু যায়-আসেনা! কাজলদির স্বামী একটু বাদে এসে সব শুনে প্রথমেই রিন্টুকে ডেকে ঠাস্-ঠাস্ করে দুটি চড় কষালেন, প্রেসিডেন্টের বাবা হবার সম্ভাবনা তিনি মনে স্থান দিলেননা।

অবস্থা যখন চরমে উঠল, তখন এলেন মেজোকাকিমার গুরুদেব। দেওঘর থেকে তিনি দয়া করে এসেছেন বিয়ে উপলক্ষে। ভুঁড়িওলা বিশাল চেহারা, দেখলে ভয়-ভক্তি হয়। ঐসব গুরুদেবদের উপকারিতা আমি সেদিন বুঝতে পারলাম। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করার বেশ দ্রুত উপস্থিত বুদ্ধি ওঁরা ব্যবহার করতে পারেন। তিনি প্রথমে সব ব্যাপারটা শুনলেন, এমনকী ছোটমামার তীব্র বক্তৃতা পর্যন্ত। তারপর স্মিতহাস্যে বললেন, 'ঐ চিনি যদি আমি খাই, তাহলে তোরা খাবি তো? শিশু হচ্ছে নারায়ণ, শোন্ তাহলে একটা গপ্পো, বৃন্দাবনে একদিন শ্রীকৃষ্ণ...। গল্পটা মহাভারত কিংবা কোন পুরাণে যে নেই—সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। গল্পের মূলকথা শ্রীকৃষ্ণও নাকি একদিন যশোদার ননীমাখনে হিসি করে দিয়েছিলেন, তাই দেখে সুদাম ঘেন্না প্রকাশ করায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, এখন থেকে শিশুর ইয়েকে যদি কেউ ঘেন্না করে—তাহলে সে আমার দয়া পাবেনা। গুরুদেব ঐ চিনির বস্তায় গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওঁ শুদ্ধি, ওঁ শুদ্ধি।'

চমৎকারভাবে সব মিটে গেল। শুধু ছোটকাকা আমাকে এক পাশে ডেকে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'তুই রান্নার ঠাকুরদের বলিস চিনি আবার নতুন করে কেনা হয়েছে। দরকার কী! যদি জিজ্ঞেস করে তাহলেই বলবি, না জিজ্ঞেস করলে কিছু দরকার নেই—'

সেবার আমাদের বাড়ির রান্নার মধ্যে রসগোল্লাই হয়েছিল সবচেয়ে ভালো। রসগোল্লার নতুন ধরনের স্বাদে প্রশংসা করে গেলেন নিমন্ত্রিতরা সবাই। আর আমি? অতক্ষণ পরিবেশন করে অন্য বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে ফস্টি করার পর —আমার আর খাবার সময় কোথায়? আমি দুটো রসগোল্লা রিন্টুর মুখে গুঁজে দিয়েছিলাম।

৩

ভদ্রলোককে দেখে আমার বারবার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছিল। বিভূতিভূষণ যদি এই লোকটিকে দেখতেন, তাহলে এঁর কথা খুব সুন্দরভাবে লেখায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন। আমার সে-ক্ষমতা নেই। বিভূতিভূষণের একটি গল্প অস্পষ্ট মনে আছে। মুদির দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করত একজন বুড়ো লোক, দোকান-টোকান বন্ধ হয়ে যাবার পর স্নান করে শুদ্ধ হয়ে একটা নিরালা জায়গায়, গাছতলায় বসে কবিতা লিখত। নিজের কবিতাই আবেগে চোখ বুজে ঢুলে-ঢুলে পড়ত। সেই কবিতার হয়তো কোন মূল্য নেই, কিন্তু লোকটির অনাবিল আনন্দের দৃশ্যটি বিভূতিভূষণ অপূর্বভাবে ফুটিয়েছিলেন।

নীলমাধববাবু অবশ্য ওরকম দরিদ্র নন। পরিবেশ, অবস্থা সবকিছুই আলাদা। ওঁর সঙ্গে দেখা উড়িষ্যার একটি ছোট্ট শহরে। শহর ঠিক বলা যায় না, যদিও বেলস্টেশন আছে, কিন্তু গ্রামই প্রায়। সুযোগ পেলেই মাঝে-মাঝে আমি এখানে-ওখানে বেরিয়ে পড়ি, সেইরকম ঘুরতে-ঘুরতে, ভদ্রক-এর কাছে সেই ছোট্ট জায়গাটায় গিয়ে পড়েছিলাম। দুপুরবেলা একটা বটগাছের নিচে বাঁধানো গোল বেদীতে বসেছিলাম চুপচাপ, কিছুই করার নেই, ফেরার ট্রেন সেই সন্ধের পর। জায়গাটায় কোন হোটেলও নেই। বাজারের কাছে গোটা দু-এক চায়ের দোকান —সেখান থেকে দুদিনের বাসি পাঁউরুটি ও আলুর দম নিয়ে মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিয়েছি। যে-টুকু ঘুরেটুরে দেখার, দু-এক ঘণ্টার মধ্যেই দেখা হয়ে গেছে, এখন কিছুই করার নেই, বটগাছের ছায়ায় বসে থাকা ছাড়া। স্টেশনের বেঞ্চির চেয়ে এ-জায়গাটাই ভালো, স্টেশনে বড্ড মাছি ভনভন করছিল।

মন্দ লাগছিল না বসে থাকতে, একা একটা অপরিচিত জায়গায় গাছতলায় বসে থাকলে নিজেকে বেশ পথিক পথিক মনে হয়—যেন আমি পায়ে হেঁটে নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে গাছের ছায়ায় দু-দণ্ড জিরিয়ে নিচ্ছি। রেললাইনের ওপারে গোটা কয়েক শিমুলগাছ একেবারে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। কোথায় যেন অনেকক্ষণ ধরে একটা ঘুঘু ডাকছে 'ঠাকুরগোপাল ওঠো, ওঠো—' বলে, ঘুঘুর ডাকে নির্জনতা অনেক বেড়ে যায়।

কুঁচোনো ধুতির ওপর ফতুয়া-পরা, হাতে ছড়ি—একজন প্রৌঢ় যেতে-যেতে থমকে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েই রইলেন, কোন কথা বললেননা। খানিকটা বাদে আবার চেয়ে দেখি, তিনি তখনও তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। এবার আমি একটু লাজুকভাবে হাসলাম। তিনি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন।

—কলকাতার ছেলে মনে হচ্ছে?

—কী করে বুঝলেন!

—দেখলেই বোঝা যায়। এদিকে কী করতে আসা হয়েছিল?

—এমনিই!

—এমনিই কেউ এখানে আসে? এখানে কি কিছু দেখার আছে নাকি?

মানুষ কোথায় কী দেখতে যায়—তা কারুকে বলে বোঝানো যায়না। যদি বলতাম, বটগাছের তলায় এই বাঁধানো বেদীটাই আমার দেখতে ভালো লাগছে, শুধু এটা দেখার জন্যই এখানে আসা যায়—তাহলে কি উনি বিশ্বাস করতেন? এমনি-এমনি ঘুরে বেড়ানো বোধহয় অপরাধ—আমি অপরাধীর মতন মুখ করে রইলাম।

সন্ধেবেলায় ট্রেন ধরব শুনে তিনি জোর করে আমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। অনেকদিন তিনি কলকাতার কোন লোকের সঙ্গে কথা বলেননি। প্রৌঢ়ের নাম নীলমাধব সিংহ, বাড়িটা বেশ ছিমছাম পরিষ্কার—জংলা মাঠের মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে বেশ নিরালার সাদা একতলা বাড়ি। গেটের সামনে সাদা পাথরে লেখা আছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য'।

নীলমাধব সিংহের পূর্বপুরুষ একসময় বাংলাদেশের লোক ছিলেন, শ-খানেক বছর ধরে উড়িষ্যার ঐ ছোট্ট জায়গাটায় আছেন। নীলমাধবের পিতৃ-পিতামহ মারোয়াড়ি মহাজনদের মতন চাষীদের টাকা দাদন দিতেন, তারপর প্রচুর সুদে টাকা উসুল করে নিতেন। বংশানুক্রমিক এই ব্যাবসাই ছিল, নীলমাধব ওটাকে ঘৃণিত কাজ মনে ক'রে নিজে ঐ-পেশা পরিত্যাগ করেছেন। এখন তিনি কিছুই করেননা।

বাড়িতে দুটি মাত্র লোক, নীলমাধব আর তাঁর স্ত্রী—স্থূলাঙ্গিনী বর্ষীয়সী মহিলা —আমাকে দেখে খাতির করবার জন্য এমন হাঁসফাঁস করতে লাগলেন যে আমি বিব্রত বোধ করলাম খুব। আমাকে খাওয়াবার জন্য তক্ষুনি ভাত চড়িয়ে দিলেন, কোন আপত্তি শুনলেননা।

বাড়ির ভেতরটা ঝকঝকে, আসবাবপত্রগুলো বেশ পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো, দেখলে বোঝা যায়, এই প্রৌঢ় দম্পতির অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল, কোন কিছুর অভাব নেই। বাড়িতে খবরের কাগজ আসেনা, নীলমাধব আমাকে জানালেন যে গত সাত-আট বছরের মধ্যে তিনি একদিনও কাগজ পড়েননি। তবে তাঁর ছেলে একটা ব্যাটারির রেডিও পাঠিয়েছে, সেটাই তাঁর বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগের অবলম্বন।

আধঘণ্টার মধ্যে ওঁদের পারিবারিক ইতিহাস আমার শোনা হয়ে গেল। ওঁদের

দুটি ছেলে একটি মেয়ে, সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। একজন ছেলে দিল্লিতে চাকরি করেন, অন্যজন রাউরকেল্লায়, মেয়েটির বিয়ে দিয়েছেন একটি ওড়িয়া ছেলের সঙ্গে, তারা থাকে ভুবনেশ্বরে। দুই ছেলে এবং মেয়ে-জামাই কত পেড়াপিড়ি করেছে ওঁদের নিয়ে যাবার জন্য, কিন্তু ওঁরা আর কোথাও যেতে চাননা। শহরের হৈ-চৈ ওঁদের একদম পছন্দ হয়না—এই গ্রামের প্রতিটি পায়ে-চলা রাস্তা, প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি গাছ তাঁর চেনা—এসব ছেড়ে কোথাও যেতে চাননা। এখানকার মানুষজনও ঐ-দম্পতিকে খুব ভালোবাসে। নইলে, মাঠের মধ্যে ফাঁকা বাড়িতে বুড়ো-বুড়ি পড়ে রয়েছে, কোনোদিন তো চুরি-ডাকাতিও হয়না।

তারপরেই আমি একটা বিচিত্র ব্যাপার জানতে পারলাম। কাচের আলমারিতে বেশ-কিছু বই আছে, অধিকাংশ বই-ই রামায়ণ-মহাভারত-জাতীয়। সময় কাটাবার জন্য সেগুলোতে চোখ বোলাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, আলমারির একটা তাক জুড়ে একটাই বইয়ের অনেকগুলি কপি। একখানা নিয়ে পাতা উল্টে দেখলাম, 'মানুষই ভগবান'; লেখকের নাম 'অধম সেবক'।

আমার হাতে বইটি দেখে নীলমাধব একগাল হেসে বললেন, 'ও বইটা আমারই লেখা। চোদ্দবছর আগে কটক থেকে ছাপিয়েছিলাম। জওহরলাল নেহরু, বিধান রায়, মদনমোহন মালব্য, মেঘনাদ সাহা, রাজাগোপাল আচারি—সবাইকে পাঠিয়েছিলাম একখানা করে। অনেকে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তোমাকেও একটা দিচ্ছি—'

যে-বই জওহরলাল নেহরু, বিধান রায় ইত্যাদি পেয়েছেন, সে-বই একখানি আমারও পাওয়া নিশ্চয়ই ভাগ্যের কথা। সেরকম কৃতার্থ মুখ করেই বইটা নিলাম। পাতাগুলো লালচে হয়ে গেছে, বড়-বড় ভাঙা টাইপে চৌষট্টি পাতার বই। আগাগোড়া পদ্য। লেখা খুবই কাঁচা, ভগবান মানুষ হয়ে জন্মায়না, মানুষই আসলে ভগবান—এই কথা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রথম আরম্ভ এইরকম :

দেহধাম জেন ভাই পুণ্য দেবালয়
পরিচ্ছন্ন রাখিলে তাহে দেবতার অধিষ্ঠান হয়...।

দুলাইন পড়েই ভক্তিভরে বইটি রেখে দিচ্ছিলাম। তিনি বললেন, 'পড়ো-না, পড়ো, এখনও তো খাবার দেবার দেরি আছে!'

প্রৌঢ়ের উদগ্রীব চোখের সামনে আমাকে বইটির সবকটি পৃষ্ঠা পড়তে হল। আসলে ফাঁকি দিয়েছি, সব পড়িনি—পড়া যায়না, পাতা উল্টে চোখ বুলিয়ে গেছি মাত্র। কাঁচা লেখা হোক, তবু বিস্ময়কর নিশ্চিত। কয়েক পুরুষ ধরে বাংলাদেশের বাইরে আছেন, তবু বাংলা ভুলে না-গিয়ে তার চর্চা রেখেছেন তো, সেটাই বা কম কী!

নীলমাধব বললেন, 'আর-একখানা লিখছি। তুমি শুনবে একটু? এখানার নাম দিয়েছি 'নব গীতা'। দেশের এই যে দুরবস্থা এই যে এত চাঞ্চল্য, তার কারণ মানুষ এই জন্মরহস্য, এই পৃথিবীর রহস্য ভুলে গেছে। মানুষকে এই মায়াময় জগতের কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। সবকিছুই যে পূর্বনির্দিষ্ট, মানুষ শুধু নিমিত্তমাত্র...'

প্রৌঢ়ের আশা, আর বছর পাঁচেকের মধ্যেই 'নব গীতা'ব রচনা তিনি শেষ করতে পাববেন। তাবপর কটক কিংবা বালেশ্বব থেকে ছাপিয়ে বিলি করবেন বিনা পযসায়। আবার পাঠাবেন ইন্দিবা গান্ধী, জ্যোতি বসু, মোবারজী দেশাই প্রভৃতিকে। এবং এই বই পডামাত্রই সবাব মন বদলে যাবে, সব হানাহানি বিশৃঙ্খলা থেমে যাবে, মানুষে-মানুষে ভাই-ভাই হযে যাবে।

ধপধপে সাদা চালেব ভাত খেলাম, সঙ্গে মুগেব ডাল, বেগুন ভাজা, ও বাড়িতে তৈবি ঘি। নীলমাধবেব স্ত্রী ভাবি যত্ন কবে খাওয়ালেন। তারপর খাটেব ওপব শীতলপাটি বিছিযে দিলেন আমার বিশ্রামেব জন্য। আর নীলমাধব অন্য খাটে বসে খুলে ধরলেন চাবখানি লাল খেরোব খাতা। আমাকে পড়ে শোনাতে লাগলেন তাঁব 'নব গীতা', ওঁর স্ত্রীও ভক্তিভরে শুনতে লাগলেন। আবেগে কেঁপে-কেঁপে উঠছে নীলমাধবেব গলা, উৎসাহে জ্বলজ্বল কবছে ছানি-পড়া চোখ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় হলে এই দৃশ্যটি কত সুন্দব লিখতে পাবতেন। আমি আব কী লিখব। আসল ব্যাপার যা হযেছিল, শুনতে-শুনতে আমার দারুণ ঘুম পেযে যেতে লাগল। অথচ ঘুমিয়ে পড়াটা খুবই অভদ্রতা। আবাব খাওযাব পর এবকম শীতলপাটিতে বসে ঘুম আটকে বাখাও শক্ত। সিগারেট খেতে খুব ইচ্ছে কবছে, কিন্তু এইরকম প্রৌঢ়-প্রৌঢার সামনে চট কবে পকেট থেকে সিগাবেট বাব করতে কিন্তু-কিন্তু লাগছে। এক-একবার ঢুলুনি আসছে, আব আমি নিজেব পাযে চিমটি কাটছি। জোব করে চোখ টান করে চেযে থাকাব চেষ্টা কবছি। ঘুমটা তাড়াতেই হবে, কেননা, ঐ কবিতাব ভাষা যতই দুর্বল আব পুরোনো হোক—এই এক নির্জন গ্রামে একজন প্রৌঢ় একখানি বই লিখে দেশেব সব কোলাহল অনাচাব থামিয়ে দেবে—এই আশা, এই দৃঢ় বিশ্বাসের দৃশ্যটি সত্যিই দেখাব মতন।

৪

জিপিও-র সামনে বিরাট লাইন পড়েছে বেকার যুবকদের। পোস্ট অফিসের কেরানিব কিছু চাকরি খালি হবে, সেইজন্য ফর্ম বিলি হচ্ছে। আগে থেকেই জানা

গেছে, চাকরি দেওয়া হবে একশো চল্লিশ জনকে, সেইজন্য ফর্ম বিলি করা হবে চৌদ্দ হাজার। একটা আধটা পোস্ট তো নয়, একশো চল্লিশটা, লাইনের ছেলেদের মধ্যে বেশ খানিকটা উদ্দীপনা চোখে পড়ে।

আমি বাসের গুমটিতে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। বেকার যুবক বলতে আগেকার গল্প-উপন্যাসে যে-বর্ণনা পাওয়া যেত, এরা কেউই সেরকম নয়। কারোরই রোগা, না-খেতে-পাওয়া চেহারা কিংবা মলিন পোশাক নয়, দিব্যি সব স্বাস্থ্যবান চেহারা প্রাণশক্তিতে টগবগ্ করছে। অনেকেই পরেছে চাপা ড্রেন পাইপ, জামায় বাহার আছে, চুল আঁচড়েছে দারুণ কায়দায়। এইসব চেহারা দেখলে মায়া কিংবা বিরক্তি আসেনা, এইসব চেহারা দেখলে ভালো লাগে।

লাইনেব মধ্যে আমার চেনা একটা ছেলে ছিল, আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে চেঁচিয়ে বলল নীলুদা, আপনি এখানে কী করছেন, তারপর লাইনের অন্য একটি ছেলেকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমার জায়গাটা রাখবেন তো দাদা!' আমার দিকে সে এগিয়ে এল লাইন ছেড়ে।

আমি আগে যে-পাড়াব ভাড়া থাকতাম, ছেলেটি সে-পাড়ার! আমাব সঙ্গে বেশ পবিচয় ছিল, নানান ছুতোয় চাঁদা নিতে আসত, বহু বই পড়ত, নিয়ে আর ফেবত দেয়নি।

আমি বললাম, 'কী রে বাবলু, কেমন আছিস!'

- আপনি এখানে কী করছেন?

একটু চোরা হাসি দিয়ে বললাম, 'আমিও ভেবেছিলাম ফর্ম নেবার জন্য লাইনে দাঁড়াব, তোকে দেখে আর লজ্জায় দাঁড়াতে পারলামনা। প্রেসটিজে লাগল!'

বাবলু রীতিমতন দাঁত বার করে বলল, 'যা-ন। আপনি এই সামান্য ছ্যাঁচড়া চাকবির জন্য লাইন দেবেন? আপনি তো আজকাল—'

—লাইন ছেড়ে যে চলে এলি, আবার ঢুকতে পারবি?

—হ্যাঁ, এক্ দাদাকে বলে এসেছি। এখন ফর্ম দেওয়া বন্ধ আছে।

—দাদা মানে? এখানকার পাতানো দাদা?

—না, না, ওর সঙ্গে এরকম সাতটা লাইনে আর তিনটে ইনটারভিউতে দেখা হযেছে। আমরা দুজনেই ভেটারান।

—তুই বি এসসি পড়তিস না? পাশ করেছিস? নাকি তার আগেই চাকরির জন্য—

—কী করব বলুন, আমাদের ফ্যামিলিতে একটা ব্যাপার হয়ে গেল—

—যাক শুনতে চাইনা! একটা-কিছু বিপদ হয়েছে তো? মানুষের দুঃখের কথা শুনতে আমার আর ভালো লাগেনা। প্রত্যেক দিন খবরের কাগজ খুললে দেখতে পাই, পথে-ঘাটে শুনি, এই যে, হাজারখানেক ছেলে দাঁড়িয়েছে—এদের

প্রত্যেকের জীবনেই এরকম কিছু আছে, আমারও আছে। সবই তো জানি, শুনে কী হবে?

—নীলুদা, একটা সিগারেট খাওয়াবেন।

বাবলুর সাহস বেড়েছে। আগে আমাকে দেখলে সিগারেট লুকতো, এখন সরাসরি চেয়েই বসল। আমি অবশ্য তেমন রাগ করলামনা, ছেলেছোকরাদের খানিকটা ঔদ্ধত্য থাকলে আমার ভালোই লাগে। সিগারেট দিয়ে দুজনে ধরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তুই বুঝি এরকম চাকরির খবর পেলেই ছুটে আসিস?'

—কী আর করি দাদা, চেষ্টা তো করতেই হবে?

—এক-একবার চাকরির চেষ্টা করতে গিয়ে কত খরচ পড়ে?

—আপনি ঠিক আসল কথাটা ধরেছেন তো। সত্যি, চাকরি না-পাওয়ার চেয়েও এইসব খরচাগুলোর জন্যই বেশি গায় লাগে। তা ধরুন, যাতায়াত বাসভাড়া তিরিশ নয়া, সার্টিফিকেটের কপি টাইপ করাতে নেয় চল্লিশ-চল্লিশ আশি, তারপর রেজিস্ট্রির জন্য আশি—টাকাদুয়েক মিনিমাম! কোন কোন শালার অফিস (আমার সামনে 'শালা' কথাটা উচ্চারণ করেও বাবলু জিভ কাটলনা) আবার পোস্টাল অরডার চায়।

—এমপ্লয়মেন্ট একসচেনজে নাম লেখাসনি? তাহলে তো আর দরখাস্ত করতে হয়না!

—আপনি আছেন কোথায়? তিন বছরে একবারও কল পাইনি। তবু এইসব খুচখাচ দরখাস্তে অনেকসময় ইনটারভিউ পাওয়া যায়। ইনটারভিউতে আবার ডবল খরচ। পাঁচ-ছঘন্টা ধরে হয়তো ফুডের জন্য কিছু পয়সা চলে যায়!

—এরকম কত জায়গায় দরখাস্ত করেছিস?

—ইনটারভিউ দিয়েছি তেরোবার। আনলাকি থারটিন পার হয়ে গেছি, এবার যদি পাওয়া যায়।

—এখানে তুই চাকরি পাবি আশা করছিস? কাগজেই তো বেরিয়েছে, একশো চল্লিশটা পোস্টের জন্য চোদ্দ হাজার ফর্ম বিলি হবে। তার মানে প্রতি একশোজনের জন্য একটা পোস্ট। কী করে বাছবে? কোন যুক্তিসম্মত উপায় আছে? এখানে অনেকের স্বাস্থ্য ভালো, সবাই স্কুল ফাইনাল পাশ তো বটেই, বি এ, বি এসসি, এম এ পাশও আছে হাজার হাজার। তারমধ্যে একশো চল্লিশ জনকে কী করে বাছবে? তুই কি এখানে লটারির টিকিট কাটতে এসেছিস?

বাবলু চুপ করে আমার দিকে তাকাল। নাকটা অদ্ভুতভাবে কুঁচকে একটা বিরক্তির ভঙ্গি করল। সিগারেটটা টুসকি মেরে ছুড়ে দিল রাস্তার মাঝখানে। তারপর জামার হাত গুটিয়ে আমার সামনে এসে বলল, 'নীলুদা হাতখানা দেখছেন? মাস্‌ল

টিপে দেখুন! শরীরে এখন দারুণ জোর, কোন অসুখবিসুখের নামগন্ধও নেই। সারাটা দিন কী করে কাটাই বলুন তো! সারাদিনরাত চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকা যায়? কোথাও একটা লেবারের চাকরি পেলেও করতাম, তা সব ফ্যাকটারিতেও তো এখন লোক নেওয়া একদম বন্ধ! আর বাড়িতে থাকলেই তো, এটা নেই সেটা নেই, এত বড় বুড়োধাড়ি ছেলে কিছু করতে পারেনা—এইসব শুনতে হয়! আর নয়তো পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে গুণ্ডামি-ছিনতাই করতে হয়। তাহলে বলুন তাই করব, টাকাপয়সার জন্য নয়, জোয়ান ছেলে—সারাদিনে একটা কিছু তো কাজ চাই, কোন কাজ নেই—কী করব, বলে দিন আমাকে!'

আমি বিচলিতভাবে বললাম, 'বাবলু, তুই একথা আমাকে জিজ্ঞেস করছিস কেন! আমি এর উত্তর কী করে জানব। এ তো আমারও প্রশ্ন। কে উত্তর দেবে জানিনা।'

৫

নদী কোথা থেকে আসছে—এর উত্তর তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই জানি। স্যার জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেছেন, নদী আসে মহাদেবের জটা থেকে। কথাটা সত্যি কিনা মিলিয়ে দেখবার জন্য আমি নিজেও অনেক নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, 'নদী তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' কুলুকুলু কলধ্বনির মধ্যে আমিও একই উত্তর শুনেছি, 'মহাদেবের জটা হইতে।'

নদীর পাড়ে বসে আমি আর-একটি প্রশ্ন করেছি, যখনই যেখানে নদী দেখেছি, আমার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে সেই প্রশ্ন, 'নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' এর উত্তর পেতে আমার দেরি হয়েছে। সকালে, সন্ধ্যায়, একা বা দলবলের সঙ্গে, শহরে বা নির্জন প্রান্তরে যেখানেই আমি নদী দেখেছি, খুব গোপনভাবে জিজ্ঞেস করেছি, 'নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ?' কখনো এই উত্তর শুনিনি, 'সমুদ্রে'। না, নদী আমাকে কোনোদিন কুলুকুলু কলধ্বনির মধ্যে বলেনি, আমি সমুদ্রে যাচ্ছি। অথচ জানি তো নদী সমুদ্রেই যায়, আর কোথাও তার যাবার উপায় নেই, তবু নদী কখনো নিজের মুখে সে-কথা বলেনা।

মানুষও তো যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে, কিন্তু মানুষ কি সে-কথা বলে? রাস্তা দিয়ে একজন মানুষ হনহন করে হেঁটে চলেছে, যদি তাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করি, কী, কোথায় চলেছেন? তিনি কি উত্তর দেবেন, মৃত্যুর দিকে? অথচ, সেইটাই তো সত্যি উত্তর। কিন্তু, কোথায় চলেছেন, একথা জিজ্ঞেস করলে, সব মানুষেরই

অন্তর্নিহিত একটি উত্তর, আর-একজন মানুষকে খুঁজতে। সবাই সারাজীবন আরেকজন মানুষকে খুঁজছে—সে-খোঁজাই বোধহয় মৃত্যুর কথা মনে পড়ায়না। নদীও যায় সমুদ্রের দিকে, কিন্তু সেকথা বোধহয় তার মনে থাকেনা, সেও বোধহয় আর-একটি নদীকে খোঁজে। পৃথিবীতে এমন একটিও নদী আছে কি, যে পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে একা-একা, সোজা গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে? ভূগোলে এমন-কথা কখনো পড়িনি। এরকম চিরকুমারী ব্রহ্মচারিণী নদী বোধহয় পৃথিবীতে একটাও নেই। সব নদীই আর-একটা নদীকে খোঁজে, সমুদ্রে যাবার আগে।

যাইহোক, নদী আর মানুষের জীবন নিয়ে এই খেলো আর সস্তা তুলনাটা বেশি টেনে লাভ নেই। মানুষের কথা যাক, আমি শুধু নদীর কথাই বলি।

জগদীশচন্দ্র নদীর ভাষা বুঝতেন, আমার সে-ক্ষমতা নেই। আমি নদীর পাড়ে বসে জিজ্ঞেস করেছি, নদী, তুমি কোথায় যাচ্ছ? নদীর জলে তখন অস্পষ্ট কোলাহল, তরঙ্গের বিভঙ্গ, যেন নদীর মধ্যে তখন খুব একটা হাসাহাসি পড়ে গেছে, পিকনিকে মেয়েদের মতন তরল ইয়ার্কিতে আসল কথা গোপন করার চেষ্টা, বুঝতে পেরেছি, নদী আমায় উত্তর জানাতে চায়না, কিন্তু তার ছটফটানি দেখলে বুঝতে পারা যায়, সে অন্য নদীকে খুঁজতে যাচ্ছে।

এলাহাবাদের ত্রিবেণীসংগম আমি বার ছয়েক দেখেছি, কলকাতার কাছেই ত্রিবেণীও আমার দেখা, আরও অনেক নদীর মিলনকেন্দ্র দেখার স্মৃতি আমার আছে, তবু, কোথাও কোন নদী দেখলেই এখনো আমার মনে হয়—কোথায় সে অন্য নদীর সঙ্গে মিশেছে—একবার দেখে আসি। জগদীশচন্দ্র কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গঙ্গোত্রীর অভিমুখে গিয়েছিলেন, আমিও একবার দুই নদীর মিলনকেন্দ্র আবিষ্কার করেছিলাম। জগদীশচন্দ্রের তুলনায় আমার প্রতিভা যত ছোট, ভাগীরথীর তুলনায় সেই নদীও তেমনি ছোট।

রোগা ছিরছিরে নদী, নাম হারাং। সাঁওতাল পরগনার নামসূচক গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। নদীর সাঁওতালি নাম হারাং, বাংলায় হারান বলতে ইচ্ছে হয় আমাদের, এমনই করুণ, অভিমানী, হারিয়ে যাবার মতন চেহারা; তার হারান নাম হলে অবশ্য আর নদী থাকে না, বলতে হয় নদ, কিন্তু নদ কথাটা আমার পছন্দ নয়, বিশ্রী শুনতে, মেয়ে-পুরুষ যাই হোক, সব নদীই নদী, যেমন সব পাখিই পাখি, পুরুষ পাখিদের তো আমরা পাখ বলিনা।

সেই হারাং নদীর পাশে ডাকবাংলো, সেখানে কয়েক বছর আগে গিয়েছিলাম আমরা কয়েকজন শহুরে বাবু ও বিবি। আমাদের পরনে চোঙা প্যান্ট, হাতে ট্র্যানজিস্টার, মহিলা দুজনের হ্রস্ব জামার ফাঁক দিয়ে বহু বাতাস ঢুকতে পারে —অর্থাৎ পোশাকের মধ্যে অনেক জানলা-দরজা, ঠোঁট ও পায়ের নোখ লাল,

অদূরে দাঁড়ানো জিপগাড়ি। আমাদের সরু-মোটা গলা ও ট্র্যানজিস্টারের কর্কশ নিনাদে সেই নির্জন নদীতীর গমগমে হয়ে উঠেছিল, প্রতি সকালবেলা এক-চতুর্থ ডজন মুর্গি কিনে এনে মহোল্লাসে হত্যা করা হচ্ছে, খোঁজ করা হচ্ছে মহুয়ার, হিন্দি ফিলমের নায়কের মতন প্যান্টের পা গুটিয়ে হাঁটুর কাছে তুলে আমরা যখন-তখন নদী পেরিয়ে যাচ্ছি।

মহিলা দুজন বলেছিলেন, 'মাগো, কী বিশ্রী নদীটা, দেখলে বমি আসে! আর কোন ডাকবাংলো পাওয়া গেলনা?'

সত্যি সে-নদী দেখে মুগ্ধ হওয়া যায়না, অনেক উদ্যোগ-আয়োজন করে খাড়া পাড় বেশ নেমে গেছে বটে, কিন্তু বহতা পরিসর আট-দশফুটমাত্র এবং হরেদরে হাঁটুজল। চারিপাশে এবড়ো-খেবড়ো পাথর ছড়ানো, জলের রং অপরিষ্কার, যেন নদী নয়, জঙ্গলের খোলা ড্রেন। সে-নদীর একমাত্র গুণ, রাত্রিবেলা অস্পষ্ট আলোয় যখন চতুর্দিক ঝাপসা—তখন শুধু হারাং নদীর জল চকচক্ করে, শোনা যায় অস্পষ্ট ছলছল শব্দ। সেইটুকুমাত্র গুণের জন্যই আমরা সন্ধ্যাবেলা হারাং নদীর পাড়ে পাথরের চাঁই-এর ওপর বসতাম। খোলা গলায় বেসুরো গানের পরিহাস-রসিকতা হত, ওগো নদী আপনবেগে পাগলপারা—এই গানও কেউ গেয়েছিল।

ডাকবাংলোর কীপারের নাম লেটু, তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লেটু, এ-নদীটা কোথা থেকে আসছে রে?'

লেটু কিছুটা অবাক হয়ে উত্তর দেয়, 'আসেনি তো। এ-নদী তো এখানেই ছিল! ই হারাং নদী বটে!'

শুনে আমাদের দলের কেউ-কেউ হাসে। অনুমান করা যায়, হারাং নদী কাছেই কোনো পাহাড়ি জলপ্রপাত থেকে এসেছে। কিন্তু নদীটা গেছে কোনদিকে? সমুদ্রে নিশ্চয়ই নয়, এ-নদীর চোদ্দপুরুষেও কেউ সাগরদর্শন করতে পারবেনা। লেটুকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, প্রশ্নটার গুরুত্ব আনবার জন্য হিন্দিতে, 'লেটু ই নদী ইধার কিৎনা দূরতক গিয়া? 'লেটু হিন্দি জানেনা, তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে, 'উও জঙ্গলের মধ্যে কুথাও হারিয়ে গিয়েছে হবেক্।'

মুর্গি বিক্রি করতে আসে ওসমান মিঞা, সে অনেক জানেশোনে, বুড়োমানুষ—তার অনেক অভিজ্ঞতা, তাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় হয়তো, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে আমার ভরসা হয়না, আবিষ্কারের নেশায় আমায় পেয়ে বসে, মনেমনে সংকল্প করে ফেলি, নদীটা কোথায় গেছে দেখতে হবে। হঠাৎ নিশ্চয়ই শুকিয়ে যায়নি, যত ছোটই হোক এরও তো জলে স্রোত আছে।

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর কারুকে কিছু না-বলে আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম একা, একটা গরাণ গাছের ডাল ভেঙে লাঠি বানিয়ে নিয়েছি, জুতো

পরিনি, শুধু গেঞ্জি গায়ে—খাঁটি পর্যটকের চেহারা। কিছুটা যেতেই দেখতে পেলাম আমাদের দলের মহিলা দুজনের অন্যতমা হারাং নদীর খাদে নেমে বনতুলসী কিংবা ঘেটু পুষ্প -চয়নে ব্যস্ত। আমাকে দেখে মুখ তুলে বললেন, 'কোথায় যাচ্ছ?' আমি বললাম, 'একটু এদিক দিয়ে ঘুরে আসছি!' শ্রীমতী বললেন, 'আমিও যাব।' বললাম, 'না-না, তোমায় যেতে হবেনা।'—একথা বলেই ভুল করেছিলাম। কেননা, মেয়েদের কোন জিনিশ বারণ করলে তারা শোনে কখনো? সেটাতেই জেদ ধরে। সুতরাং তিনি বললেন, 'হ্যাঁ যাব!' আমি তবু বললাম, 'না, যেতে হবেনা! ওরা বকাবকি করবে। তাছাড়া আমার ফিরতে দেরি হবে।' শ্রীমতী বললেন, 'বেশ করব যাব। তোমার সঙ্গে তো যাচ্ছিনা, আমি আলাদা যাচ্ছি।'—অর্থাৎ তিনি রইলেন নদীর অন্য পারে, সেই প্রাচীন রূপকথার নারী-পুরুষের মতন।

নদী কোথা থেকে আসছে—তা দেখার আমার কৌতূহল নেই, সুতরাং নদীর স্রোত যে-দিকে আমরা সেই দিকে হাঁটছিলাম। ক্রমশ জঙ্গল একটু ঘন হল, একটু গভীর, নদীর পাড় দিয়ে চলার রাস্তা নেই—এমন রুক্ষ পাথর ও আগাছার ঝোপ। তাছাড়া আর-একটা অসুবিধে, গ্রামবালকরা তাদের সকালের কাজকর্ম নদীর ধারেই সেরে রেখে যায়—যে-কোন মুহূর্তে তাতে পা পড়ার সম্ভাবনা। ওপার থেকে শ্রীমতী চেঁচিয়ে বললেন, 'কী বিশ্রী জায়গা, আমার আর ভালো লাগছেনা।' আমি বললাম, 'কে তোমায় আসতে বলেছিল?' শ্রীমতী রাগতভাবে বললেন, 'চলো, ফিরে যাই।' আমি বললাম, 'তুমি ফিরে যাও। আমি যাবনা।' শ্রীমতী এবার কাঁদো-কাঁদো, 'এতটা চলে এসেছি, এখন আমি একলা ফিরব কী করে!' আমি বললাম, 'তাহলে যা-ইচ্ছে তাই করো।' শ্রীমতী এবার বললেন, 'নীলুদা, আপনি এরকম—'

তখনো নদী তেমন চওড়া হয়নি, কিন্তু জল গভীর হতে শুরু করেছে। কিছু একটা দেখতে পাবার উত্তেজনা এসেছে আমার মধ্যে। আমি এগিয়ে চললাম, শ্রীমতী একবার এপারে আসবার চেষ্টা করলেন কিন্তু জলে নেমে দেখলেন শাড়ি অনেকখানি তুলতে হয়, সুতরাং নিবৃত্ত হয়ে অগত্যা আবার সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। এবং অবলীলাক্রমে মিথ্যা অভিযোগ করে বললেন, 'তুমি শুধু-শুধু আমায় এতদূর নিয়ে এসে—এখন একা ছেড়ে দিতে চাও!' বেশ জোরে হাওয়া বইছে সুতরাং আমাকে চেঁচিয়ে ওপার থেকে বলতে হল, 'কী মিথ্যেবাদী! মোটেই আমি তোমাকে আনিনি। আমি একা-একা আসছিলাম, তুমিই তো জোর করে আমার সঙ্গে এলে।' শ্রীমতী আরও রেগে গিয়ে বললেন, 'মোটেই না। আমিই তো একা-একা ফুল তুলছিলাম। তুমিই তো দেখিয়ে-দেখিয়ে আমার সামনে দিয়ে আসছিলে, উদ্দেশ্য আমায় সঙ্গে ডাকা।' আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, 'বয়েই গেছে আমার তোমায় ডাকতে!'

ক্রমে বেশ বেলা হয়ে এলো, রোদ্দুর প্রগাঢ়, ইচ্ছে হয় গা থেকে গেঞ্জিটাও খুলে ফেলতে। কিন্তু ওপারে মাত্র তো কয়েক হাত দূরেই শ্রীমতী, সুতরাং খালি গা হওয়া যায়না। পথে একটা ছোট্ট গ্রাম পেরিয়ে এলাম, একটা চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই—এমন ছোট গ্রাম শুধু হোগলাপাতার কয়েকখানা ঘর আর কিছু মুর্গি ছাগল ও উলঙ্গ শিশু। আবার জঙ্গল। দুপুরের কাছাকাছি আমি সেই অভীষ্ট অঞ্চলে পৌঁছুলাম।

লাট্টুর মতো দেখতে একটা ছোট্ট টিলা, ভেড়ার লোমের মতন তার গায় ছোট-ছোট আশসেওড়ার জঙ্গল, তার মাঝখান দিয়ে বিনা নোটিশে নেমে এসেছে আর-একটা নদী, একটু পুরুষ ধরনের বলশালী নদী, পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে তার জলে সাদা ফেনা পর্যন্ত ওঠে। সেই নাম-না-জানা নদীতে এসে মিশেছে আমাদের হারাং। এখানেই হারাং-এর জন্ম সার্থক। হারাং যেখানে অন্য নদীতে মিশেছে—সেখানে তারও জল স্বচ্ছ, তার জল দুলছে, ঘূর্ণিতে নেচে উঠছে, আনন্দে সেখানে সে আত্মহারা, যেন সেই জায়গাটা অবিকল একটা পেঙ্গুইন এডিশান প্রয়াগসঙ্গম। ঐ ছিরছিরে, রোগা পটকা হারাং এখানে ঘূর্ণি ঘুরিয়ে নাচছে। আমি আবিষ্কারের আনন্দে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম।

শ্রীমতী বললেন, 'আমি ওপারে যাব!' এখন তাঁর কণ্ঠস্বরে ক্রোধ নেই, অনুনয়। আমি বললাম, 'চলে এসো!' শ্রীমতী বললেন, 'পারছিনা, তুমি এসো।' আমিও পা ডুবিয়ে লাঠি বাড়িয়ে দেখলাম, জল বেশ গভীর, তাছাড়া স্রোতের টান খুব, পা স্থির রাখা যায়না। বললাম, 'উঁহু, যেতে পারছিনা।' শ্রীমতী করুণকণ্ঠে বললেন, 'আমার একা ভালো লাগছেনা। না, তুমি এসো। যেমন করে হোক।' —আমি বললাম, 'একা কোথায়। এই তো এদিকে আমি রয়েছি, কতটাই-বা দূর।' শ্রীমতী তবু বললেন, 'না, তমি এদিকে এসো। মাঝখানে নদীটা ভালো লাগছেনা।' আমি বললাম, 'তাহলে আগেই এলেনা কেন? যখন জল কম ছিল?' শ্রীমতী বললেন, 'আগে ইচ্ছে করেনি। কিন্তু এখন আমার একা ভালো লাগছেনা।'

শ্রীমতী তখন সেই দুই নদীর মেশার জায়গায় জলের ঘূর্ণি ও ঢেউভাঙার খেলার দিকে বিষণ্নমুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

৬

পণ্ডিতমশাইকে গিয়ে বললাম, আপনি একটা বিধান দিন। ধর্ম তো মানুষের প্রাণ বাঁচাবার জন্যই। ধর্মের তো উদ্দেশ্য মানুষকে মেরে ফেলা নয়।

পণ্ডিতমশাই উঠোনে হাঁটু ছড়িয়ে বসেছিলেন। হাঁটুর দুপাশে গোল করে সুতো জড়ানো, অর্থাৎ উনি পৈতের গ্রন্থি দিচ্ছেন, এখন কোন কথা বলবেন না। রিফিউজি কলোনির ছোট কাঁচা বাড়ি, মাটির উঠোন, একপাশে একটা ঝিঙে গাছে তকতক্ করছে দুটো নতুন ঝিঙে। পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে এসেছিলাম আমার ঠাকুমার জন্য। আমার ঠাকুমা কয়েকদিন ধরে কিছুই খাচ্ছেননা প্রায়, সামান্য কিছু দাঁতে কাটছেন। দুসপ্তাহ ধরে আমাদের এলাকায় রেশনে, আলোচাল দেওয়া হচ্ছেনা। আমার ঠাকুমা সাঁইত্রিশ বছর ধরে বিধবা, তিনি সেদ্ধচাল খাবেননা, আর প্রায় সারাজীবন পূর্ববঙ্গে থেকে এসেছেন–সুতরাং ভাতের বদলে রুটি মুখে রোচেনা, রুটি খেলে নাকি সহ্য হয়না, ফল খেতেও অরুচি; অতএব, ক'দিন ধরেই এটাওটা অজুহাত দেখিয়ে প্রায়োপবেশন করে আছেন। বহু চেষ্টা করেও আমি আতপচাল জোগাড় করতে পারিনি। ঠাকুমাকে একবার ধমকে বললাম, 'সেদ্ধচালই খাও-না। কে দেখতে যাচ্ছে।' ঠাকুমা একগাল হেসে বললেন, 'খাবার সময় আমি নিজের চোখে তো দেখবই! নাকি, অন্ধকারে খাওয়াবি।'

আমি বললাম, 'ঠাকুমা, আমি অনেক বই পড়েছি, বিধবাদের সেদ্ধচাল খাওয়া বারণ–একথা কোথাও লেখা নেই। তুমি আমার কথা রেখে খাও!'

তিনি বললেন, 'ওসব যুদ্ধ-বিপ্লব তোরা করিস বাপু। আমার তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে–এখন আমি পরকালটা ঝরঝরে করতে যাব? দুদিনের জন্য নিয়ম ভেঙে চিতায়ও শান্তি পাবনা। রোদ্দুরে ঘেমে এসেছিস, যা, মুখেচোখে জল দিয়ে আয়। তারপর আমার কাছে বোস, পাখার হাওয়া করি।'

মাথার ওপর ইলেকট্রিকের পাখা ঘুরছে, তবু 'হাওয়া করি' বলা ঠাকুমা-দিদিমাদের অভ্যেস। শুনলেই মনে হয় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ি, মনে হয় আঃ, কী ঠাণ্ডা!

ক'দিন ধরেই ঠাকুমাকে দেখে খুব মন খারাপ লাগছে। শুধু খাওয়া না, একটা প্রতিষ্ঠানই যেন বন্ধ হয়ে গেছে। ৭০ বছর বয়েস হয়ে গেলেও তাঁর শরীর এখনও শক্ত আছে, নিজেই নিজের রান্না করেন। খুব ভোরে উঠে স্নানটান সেরে পুজো-আহ্নিকে ঘণ্টাদুয়েক কাটে, তারপর ঢোকেন হবিষ্যি-রান্নাঘরে। তারপর প্রায় সারাদিন ধরে টুকটাক কত কী যে রান্না চলে তার ঠিক নেই। নিমপাতা ভাজা, হিঞ্চে শাক, ডাঁটা চচ্চড়ি, আলুর খোলা ভাজা, উচ্ছে আর লাউয়ের সঙ্গে মেথি

পোড়া দিয়ে কাঁচা মুগের ঠাণ্ডা ডাল, কাটোয়ার ডাঁটাচচ্চড়ি, চিচিঙ্গের ছেঁচকি–এইসব গাছপালার আবর্জনা খেয়ে শরীরের কিছুই হয়না জানি, তবু ঐ রান্নাতেই আনন্দ আর সময় কাটান। আনন্দে আছেন বলেই শরীর ভালো আছে। আমি মাঝেমাঝে টুকটাক উঁকি দিয়ে ঠাকুমার রান্না এটাসেটা চেয়ে খেতাম। আরও ছেলেবেলায়, ঠাকুমা যখন সারা ঘরে বাসনপত্র ছড়িয়ে খেতে বসে গল্প করতেন, আমি তখন আমডাল-মাখা ভাতের এক গেরাস খাবার জন্য মুখ বাড়িয়ে দিতাম। ক'দিন ধরে–এসব বন্ধ। ঠাকুমা আর রান্নাঘরে ঢোকেননা–ভাতই নেই, শুধু, শাক-তরকারি কে খায়। ফলটল কেটে দেওয়া হচ্ছে ওঁর জন্য, কিন্তু ওঁর সারাদিন সময় কাটে কী করে?

পণ্ডিতমশাই পৈতের গ্রন্থি বেঁধে, মুখ তুলে বললেন, 'আমি আর কী করব বলো। তোমরাই বলো-না গিয়ে সেদ্ধচালই খেতে। আজকাল তো অনেকেই খাচ্ছে।'

–সে তো আমাদের মা-মাসিমা-বৌদির বয়েসী যাঁরা অনেকদিন শহরে আছেন–তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, তাঁদের সেদ্ধচালে আপত্তি নেই। কিন্তু দিদিমা-ঠাকুমাদের কে বোঝাবে? আপনারা ছাড়া?

–শাস্ত্রজ্ঞ হয়ে, নিয়ম ভাঙার কথা মুখ দিয়ে কী করে উচ্চারণ করি বলো? তাছাড়া, তোমার ঠাকুমা হলেন স্বর্গত অমুকচন্দ্র অমুকের বিধবা স্ত্রী, কত বড় নিষ্ঠাবান ছিলেন তোমার ঠাকুরদাদা, তাঁর পত্নীকে শাস্ত্র না-মানার কথা আমি নিজের মুখে বলতে পারবনা।

–পণ্ডিতমশাই, এর মধ্যে শাস্ত্রটা আবার কোথায়? শাস্ত্রে আত্মসংযমের কথা থাকতে পারে, কিন্তু না-খাইয়ে মেরে ফেলার কথা আছে?

–তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে শাস্ত্র নিয়ে তর্ক করা আমার সাজেনা। শাস্ত্রের রহস্য অনেক গূঢ়।

একথা বলে তিনি আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, যার অনুক্ত বক্তব্য হল, খুব না হয় দুপাতা ইংরিজি পড়ে প্যান্টালুন চড়িয়ে সিগারেট টানতে শিখেছ, কিন্তু আসতে তো হল আমার কাছে! দেখো-না বাছাধন, এমন ইস্ক্রু টাইট দেব–। আমার ইচ্ছে হল পণ্ডিতমশাইয়ের রোগা দেহটা, দুহাত দিয়ে শূন্যে তুলে একটু শাস্ত্রচর্চা করি। কিন্তু তখনই মনে পড়ল, মাথা গরম করলে এখানে কার্যসিদ্ধি হবেনা। সুতরাং আমি প্যান্টালুনের ক্রিজ অগ্রাহ্য করে ওঁর পাশে মাটিতেই দুম করে বসে পড়লাম। এবং বিনীত গলায় জানালাম, 'পণ্ডিতমশাই, আমি শাস্ত্র কিছুই জানিনা–কিন্তু সেটা আমার দোষ নয়, শিক্ষার দোষ। আমায় কেউ শেখায়নি, শেখবার সুযোগও দেয়নি। তবে, যে-কোন সংস্কৃত কথা শুনলেই মনে হয় শাস্ত্রের

কথা। সংস্কৃতে একটা কথা আছে না, বিপদে নিয়মো নাস্তি? এখন যখন আতপ পাওয়া যাচ্ছে না–'

–লুচি ভেজে খাওয়াও। ফল খাওয়াও।

–কিন্তু ওঁর যে সহ্য হয়না। ভাত খাওয়া চিরকালের অভ্যেস। অম্বুবাচীর সময় ওঁকে তিনদিন উপোস করতে দেখেছি, কিন্তু এখন যে ছ-সাত দিন হয়ে গেল! আপনারা শাস্ত্র দেখে যদি বিধান দেন যে, সেদ্ধচালে কোন দোষ নেই, তাহলে বাংলাদেশে কত বিধবার যে উপকার হয়।

–সেদ্ধচালে শরীর উত্তপ্ত হয়, তা জান!

আমি কোনক্রমে হাসি চেপে বললাম, 'অরুণের জ্যাঠামশাইয়ের বয়েস পঁচাত্তর, তিনি সেদ্ধচাল খেলে উত্তপ্ত শরীর নিয়ে যদি–'

–পুরুষের কথা আলাদা! শাস্ত্র লোকাচারে বিধবার অনেককিছু ভক্ষণ করার নিষেধ আছে।

–বিদ্যাসাগরমশাই শাস্ত্র ঘেঁটে যদি বিধবাবিবাহের নির্দেশ বার করতে পারেন, আপনারা বিধবার সেদ্ধচাল খাবার নির্দেশ বার করতে পারবেননা?

পণ্ডিতমশাই শরীর মুচড়ে বললেন, 'আমাকে যে একটু বেরুতে হবে, বাবা। এখন তো তর্কের সময় নয়, এবার তাহলে তুমি–'

পণ্ডিতমশাইয়ের নির্দেশ আমি আদায় করতে পারিনি। কিন্তু বাজার থেকে তখুনি আমি ভালো-ভালো কোম্পানির লিভার এক্সট্র্যাক্ট, প্রোটিন কিনে এনে বোতলের লেবেল ছিঁড়ে ঠাকুমাকে খাওয়াচ্ছি। বিধবার পক্ষে আমিষ খাওয়া উচিত নয়, তবু আমি অন্য কথা বলে ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়াচ্ছি। কিন্তু, আমার মন পরিষ্কার, আমি জানি আমি কোন অন্যায়, কোন পাপ করছিনা।

সরমাদি আমাদের পাশের বাড়িতে থাকেন। এখন বয়েস ৪২, দশবছর আগে বিধবা হয়েছেন। সরমাদি সংস্কৃতে বি.এ. অনার্স, একটা স্কুলে কাজ করেন, শাস্ত্র শোনার জন্য কোন পণ্ডিতমশাইয়ের কাছে যাননা। সরমাদি রঙিন শাড়ি পরেন, হাতে একগাছি করে সোনার রুলি, সেদ্ধচাল খান–কিন্তু পাড়ায় সরমাদির নামে কোন অপবাদ নেই, সকলেই তাঁকে সমীহ করে। আমি সরমাদিকে একদিন চুপিচুপি জিজ্ঞেস করলাম, 'সরমাদি, তুমি এতসব ভেঙেছ, কিন্তু তুমি এখন আর মাছ-মাংস খাওনা কেন? তুমি তো জান বিধবাদের মাছ-মাংস খাওয়ার মধ্যে কোন অন্যায় থাকতে পারেনা। বিপত্নীকরা যদি পারে–তবে বিধবাদেরই বা কেন–। তুমি সাহস করে–'

সরমাদি বললেন, 'দূর পাগলা!'

আমি বললাম, 'না সত্যিই, তোমাদের মতো কয়েকজনের উচিত আরম্ভ করা।

প্রকাশ্যে স্বীকার করা। তোমাদের মতো যাদের লোকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করে, তারা যদি শুরু করে, অন্যান্য সাধারণ ঘরের বিধবারাও ভরসা পায়। দেখো, আজকাল দুধ-ঘি কিছু খাওয়া যায়না, শুধু শাক-পাতা আর একবেলা ভাত খেয়ে বিধবার চল্লিশ পেরুতে-না-পেরুতেই পুরো বুড়ি। দাঁত পড়ে যায়, চোখ খারাপ হয়, শরীর বেঁকে যায়, ঘর থেকে বেরুতে পারেনা, জীবন্মৃত অবস্থা। বুড়ি মেমসাহেবদের দেখো তো একা-একা সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়ায়। বার্ধক্যেরও একটা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু বাংলাদেশের সাধারণ ঘরের বুড়ি-বিধবারা?'

সরমাদি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, একেই বাজারে মাছ-মাংসের যা অবস্থা! তার ওপর যদি আবার বিধবারা খাওয়া শুরু করে, তোদের কপালে একটুকরোও জুটবেনা।'—তারপর সরমাদি নিচু গলায় বললেন, 'না, তোকে সত্যিকথা বলি, আগে, মানে কপাল সাদা হওয়ার আগে মাছ খেতে বিষম ভালোবাসতাম। একবেলা মাছ না থাকলে মুখে ভাত রুচতনা। কিন্তু এখন মাছ খেতে কেন পারিনা জানিস, লোকে হ্যাংলা বলবে। ভাববে, আমার লোভ কতখানি। সাদা কাপড় বেশি ময়লা হয় বলে যুক্তি দেখিয়ে আমি রঙিন শাড়ি পরতে পারি, সোনার চুড়ি যখন আছেই—তখন বাক্সে না-রেখে হাতে রাখাই নিরাপদ। কিন্তু মাছ-মাংসের বেলায় কোনই যুক্তি টিঁকবেনা। শুধু ভাববে, আমার হ্যাংলামি। এমনকী বিধবারা প্রেম করে আবার বিয়েও করতে পারে, কিন্তু নিজেনিজেই মাছ-মাংস খাওয়া শুরু করতে পারেনা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা যদি এতে সম্মতি দেন, সমাজে প্রচার করেন, কাগজে-টাগজে লেখেন, বাড়ির পুরুষেরা যদি জোর করে, তবে চালু হতে পারে। দেখ, হয়তো আস্তেআস্তে এসব বদলে যাবে।'

আমি বললাম, 'বদল হয় হয়তো, কিন্তু এত আস্তে যে চোখে দেখা যায়না। ছেলেবেলায় দেখতাম ট্রামের জানালার পাশে বসা একধরনের টিপিক্যাল অফিসযাত্রী, ঠনঠনের কালীবাড়ির পাশে এলেই মেশিনের মতো যাদের হাত কপালে উঠে যেত। ভাবতাম, আমাদের জেনারেশনে হয়তো এসব বদলে যাবে, কিন্তু এখনও ঠিক ঐ একই চেহারার লোকদের দেখি কপাল ঠুকতে। বছর পনেরো আগে একটা অফিসে একজন লোক আমার কাছে ঘুষ চেয়েছিল। মাঝবয়েসী, গুপো চেহারার সেই লোকটা। সেই অফিসে কয়েকজন ছেলে-ছোকরা কর্মচারীও ছিল। ভেবেছিলাম, বুড়োরা বিদায় নিলে—এই ছেলে-ছোকরারাই যখন সব চেয়ারে বসবে—তখন সবকিছু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। কয়েকদিন আগে সেই অফিসে গিয়েছিলাম, ঠিক সেইরকম মাঝবয়েসী আর-একটা গুঁপো লোক আমার কাছে ঘুষ চাইল। এরা বদলায়না, এরা অমর। ভেবে দ্যাখো আমাদের পাড়ার যে ভটচাজ্যি পণ্ডিতমশাই—শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে কি উনিই ছিলেন না?'

টুকুন আমার এক বন্ধুর বোন—হঠাৎ বাসে তার সঙ্গে দেখা। কুড়ি-বাইশ বছর বয়েস, ভারি ছটফটে ঝলমলে মেয়ে, বছর তিনেক আগে ওর বিয়ে হয়ে যাবার পর আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার ছোট বোনের বন্ধু ছিল। হঠাৎ মনে পড়ল গতমাসে আমার বোনের বিয়েতে তো টুকুন আসেনি। আমার বোনের ও প্রাণের বন্ধু, নেমন্তন্ন নিশ্চয়ই করেছিল। আমি জিগগেস করলাম, 'এই টুকুন, তুই আমার বোনের বিয়েতে এলিনা কেন রে? ভারি অহংকারী হয়েছিস, না?'

টুকুন হঠাৎ মুখের আলো নিবিয়ে আস্তেআস্তে বলল, 'পরে একদিন যাব। বিয়েবাড়িতে বিধবাদের যেতে নেই।'

আমি আর্ত চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, টুকুনের বাবা পাশ থেকে বললেন, 'বিয়ে হবার দুমাস পরেই টুকুনের স্বামী দুর্ঘটনায় মারা গেছে!' আমি টুকুনের দিকে তাকালাম, কোন চিহ্ন নেই, দামি রঙিন শাড়ি পরেছে, হাতভর্তি গয়না, খোঁপায় হাতির দাঁতের ফুল, কপালে লাল টিপ পর্যন্ত। কিন্তু মনে হল একটা খড়-মাটির প্রতিমার গায়ে পোশাক চড়ানো। আমি আবার তাকালাম, হ্যাঁ, অবিকল খড়-মাটির প্রতিমা। অল্পদিনের মধ্যেই ঐ শরীরের রঙ জ্বলে যাবে, উঠে যাবে, গায়ের মাটি গলে যাবে, দু-এক বছর পরেই আমি টুকুনের দেহের খড়ের কাঠামোটা শুধু দেখতে পাব!

৭

'নাগরদোলা ঘুরছে, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'জোরে, আরও জোরে ঘোরাও। আরও। দুধ-সাবু খেয়ে চালাচ্ছ নাকি? আরও জোরে?'.

বিপরীত দিকের দোলনটা থেকে সেই মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল, 'এই, এই, আর না, আর না—আমার মাথা ঘুরছে! থামাও থামাও!'

সুন্দরী মেয়েকে ভয় দেখাতে কার না ইচ্ছে হয়! হোক-না অচেনা! আমি লঘু গলায় ফের দোলনাওয়ালাদের উত্তেজিত করতে লাগলাম, 'না, না থামবে না। আরও জোরে!'

মেয়েটি এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, না, খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি! দোলনা ছিঁড়ে পড়বে!'

আমি বললাম, 'অত ভয় পেলে নাগরদোলায় উঠতে গেছেন কেন?'

এই থেকে আলাপ। শান্তিনিকেতনের পৌষ মেলায় ঘুরন্ত বাতাসের মধ্যে দেখা। এক দোলনায় আমরা চারজন, অন্য দোলনায় ওরা। আমাদের দোলনায়

বন্ধু, তার স্ত্রী ও শ্যালকের সঙ্গে আমি, ও-দোলনায় ওরা চারজন মেয়ে। সেই মেয়েটির গায়ের রং কুচকুচে কালো। কিন্তু অমন রূপসী মেয়ে কদাচিৎ চোখে পড়ে। সবার চোখ ঘুরে-ঘুরে ঐ মেয়েটির দিকেই আসবে। কালো ঝকঝকে শরীর তার পরনে সাদা শাড়ি, ব্লাউজ সাদা, চটি সাদা, হাতে ঘড়ির ব্যান্ডটাও সাদা, আর-কোন অলংকার নেই—গলায় শুধু একটা শ্বেত মুক্তামালা। কোনাবকের সুরসুন্দরী মূর্তি যে দেখেছে সেই শুধু মেয়েটির রূপ খানিকটা অনুমান করতে পারবে।

নাগরদোলা থামল, ওরা নেমে পড়তেই আমি বললাম, 'একি, হযে গেল? আর-একবার ঘুরবেন না?'

অচেনা মেয়েরা সবসময় অনুরোধ বোঝে না। অনুরোধকে মনে করে 'আওযাজ দেওয়া'। সেই মেয়েটি কিছু বলবার আগেই তার সঙ্গিনী অন্য একটি বার্লি-খাওযা চেহাবার মেয়ে বলল, 'কী অসভ্য ছেলেগুলো, চল কৃষ্ণা—'

নাম জানলাম, কৃষ্ণা। আমার এক পিসিরও গায়ের রং ছিল খুব কালো —নাম ছিল পূর্ণিমা। অচেনা লোকজনের মধ্যে তাঁকে পূর্ণিমা বলে ডাকলে তিনি হেসে আকুল হতেন। বলতেন, 'চেঁচিয়ে ডাকিস না—লোকে পূর্ণিমা শুনে তাকিয়ে দেখবে কালো একখানা অমাবস্যা।'

হোমিওপ্যাথিক ওষুধের বোগ নির্ণয়েব মতন শান্তিনিকেতন মেলায় সবাই সবাব কোনো-না-কোনো সূত্রে চেনা। বিকেলবেলা আমার বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গেলাম তাব এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে। সেই অধ্যাপকের আবাব এক অন্যবন্ধুর ছোটবোনের চারজন বান্ধবী বেড়াতে এসেছে। ওরকম সম্পর্ক ধরলে পৃথিবীর সবাই যে সবাইকার বন্ধু-বান্ধবী, মানুষ সেটা ভুলে যায়। সুতরাং আমার বন্ধুর বন্ধুব ছোট বোনের চারজন বান্ধবীকে আমি মোটেই পর ভাবলাম না। আপন-আপন ভেবে বিনাদ্বিধায় আলাপ-পরিচয় শুরু করে দিলাম। নাগরদোলার সেই চারজন, তাদেব মধ্যে কৃষ্ণা।

অনেক মেযের কালো রঙের জন্য লজ্জা থাকে। কৃষ্ণার নেই, কৃষ্ণা অহংকারী। সে জানে, সব পুরুষই তার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবতে বাধ্য। চায়ের কাপ ঠোঁট থেকে নামিয়ে কৃষ্ণা বলল, 'আপনি ভারি পাজি। নাগরদোলা অত জোরে চালাতে বলছিলেন কেন?'

আমি বললাম, 'চলুন, আমার সঙ্গে আবাব চড়বেন আসুন। আমি ভয় ভাঙিয়ে দিচ্ছি!'

কৃষ্ণার সঙ্গিনী সেই বার্লি-খাওয়া মেয়েটি কড়া চোখে তাকাল। তাকে দেখলেই মনে হয়—ভবিষ্যতে সে কোন মেয়ে হস্টেলের সুপারিনটেন্ডেন্ট হবে। তা হোক, তাতে আমার কোন ভয় নেই। আমারই পেড়াপিড়ি ও আগ্রহাতিশয্যে

ফের দলবল মিলে সবাই এলাম নাগরদোলায় চাপতে। এখন তো আলাপ হয়ে গেছে, এখন আর দ্বিধা কী! নাগরদোলায় প্রবল ঘূর্ণির মধ্যে আমি কৃষ্ণার বাহু চেপে ভয় দেখিয়ে বললাম, 'এবার ফেলে দিই? দিই ফেলে?' বাচ্চা বালিকার মতন কৃষ্ণা হাসতে-হাসতে ভয় পেতে লাগল। আমি এমনিতে একটু বোকা-সোকা, লাজুক ধরনের ছেলে, কিন্তু কৃষ্ণার পাশে বসে হঠাৎ যে কী করে সেদিন অত চালু হয়ে গেলাম, কে জানে!

কলকাতা শহরটা আসলে খুব ছোট। কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে বেরিয়ে পড়ল—যদিও কৃষ্ণা থাকে বালিগঞ্জে—আমি থাকি চরম উত্তর কলকাতায় —তবু ওর চেনা কয়েকজনকে আমি চিনি—আমার চেনা কয়েকজনকে চেনে কৃষ্ণা। ঐ যে আগেই বলেছি, বন্ধুর বন্ধুতেই পৃথিবীটা ভর্তি।

শান্তিনিকেতনে আমি একদিন বেশি থেকে গেলাম, আগের দিন চলে গেল কৃষ্ণারা। যাবার আগে কৃষ্ণা ওর বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার লিখে দিয়ে গেল, আমিও দিলাম আমারটা। স্টেশনে দাঁড়িয়ে ট্রেন ছাড়ার আগে বেশ আন্তরিকভাবেই বলল, 'বাড়িতে আসবেন কিন্তু একদিন। ঠিক আসবেন!'

শান্তিনিকেতন থেকে চলে গেলাম মাসাঞ্জোর, সেখান থেকে দুর্গাপুর ঘুরে কলকাতায় ফিরলাম সাতদিন বাদে। রাত্তিরবেলা জি টি রোড ধরে বন্ধুর জিপে করে আসছিলাম, সেদিন চাঁদের আলো পৃথিবীটা ধুইয়ে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল কৃষ্ণার কথা।

কিন্তু কৃষ্ণাকে আমি কোনদিন ফোন করিনি, চিঠি লিখিনি, দেখা করতেও যাইনি। কেন? ঠিক কারণটা আমি নিজেও জানিনা। এইজন্যই তো আমি গল্প লিখতে পারিনা। গল্পে যা-যা মানায় তার কিছুই ঠিকমতো আমার মাথায় আসেনা। শান্তিনিকেতনে অমন চমৎকারভাবে যে-রূপসী মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হল, নিজের হাতে ঠিকানা লিখে দিয়ে যে কলকাতায় আবার দেখা করতে বলল--তার সঙ্গে দেখা করে পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ করাই তো স্বাভাবিক, গল্পেও সেইরকম হয়। কৃষ্ণার সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা এখনো আমার কাছে আছে—অথচ একদিনও আর দেখা হয়নি।

আমি কেন দেখা করিনি? একজন মানুষের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশজন মানুষ লুকিয়ে থাকে। একই মানুষ, কিন্তু মায়ের সামনে, অফিসের বড়বাবুর সামনে, বন্ধুর সামনে, স্ত্রীর সামনে এবং প্রেমিকার সামনে, ছোটভাইয়ের সামনে—সে বিভিন্ন, বলা যায় সম্পূর্ণ আলাদা ব্যক্তিত্ব। সেইরকম, যে-মানুষ শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় বেড়াচ্ছে আর যে কলকাতার ভিড়ের বাসে ঝুলছে—এরা দুজনেও আলাদা। শান্তিনিকেতনে কৃষ্ণার সঙ্গে কথা বলার সময়ে কোন দ্বিধা ছিল না, বিনা

ভূমিকায় অনায়াসেই লঘু চাপল্য এবং ইয়ারকি শুরু করতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতায় অন্যরকম। শান্তিনিকেতনের সেই একখানা বিরাট আকাশ, লাল ধুলোর রাস্তা, মেলার হট্টগোল আর সোনাঝুরি গাছে হাওয়ার ঢেউ—এই পটভূমিকার বদলে ট্রামলাইন পেরিয়ে গলিতে ঢুকে বাড়ির নম্বর খুঁজে—দরজার কলিংবেল বাজিয়ে বা কড়া নেড়ে বৈঠকখানায় বসে কৃষ্ণার সঙ্গে দেখা হলে সবকিছু অন্যরকম হতে বাধ্য। টেলিফোন করেই-বা কী বলব? বলব কোথাও দেখা করতে? নিয়ে যাব কোন রেস্টুরেন্টে? যাকে নাগরদোলায় চাপার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তাকে কি ঠিক সেই একইভাবে রেস্টুরেন্টে আসার আমন্ত্রণ জানানো যায়? আমি ভেবে পাইনি। আমি আর দেখা করিনি কৃষ্ণার সঙ্গে।

দেখা করিনি, কিন্তু ক্ষীণ আশা করেছিলাম—কৃষ্ণা নিজে হয়তো আমাকে চিঠি লিখবে বা দেখা করবে। আবার জানতাম, তা অসম্ভব। কোন মেয়ে যেচে কোন ছেলেকে চিঠি লেখে নাকি আগে?—ছেলেটিকে তার ঠিকানা দেওয়া সত্ত্বেও! আর, কৃষ্ণা ওরকম ঝলমলে রূপসী—তার নিশ্চয়ই অনেক অনুরাগী—তার বয়েই গেছে আমার মতন হেঁজিপেঁজিকে চিঠি লিখতে।

পৌষমেলা হয় শীতকালে তখন প্যান্ট-কোট পরার সময়। কৃষ্ণার ঠিকানা লেখা কাগজটা রয়ে গেল আমার কোটের পকেটে। শীত ফুরোলে কোটটা কাচতে না-দিয়েই আলমারিতে তুলে রাখলাম। পরের বছর শীত যখন পড়ি-পড়ি করছে—গরম জামাগুলো সব নামতে শুরু করেছে—কোটের পকেট থেকে অন্য অনেক কাগজপত্রের সঙ্গে বেরুল সেই ঠিকানা লেখা টুকরো কাগজটা। মনে পড়ল আবার কৃষ্ণার কথা, সেই কষ্টিপাথরের মতন উজ্জ্বল মসৃণ দেহ, সেই শিশুর মতন সরল পবিত্র মুখ, মনে পড়ল সেই শ্বেতবসনা সুন্দরীকে। বুকের মধ্যে একটু টনটন করে উঠল। কৃষ্ণা খুব আন্তরিকভাবে বলেছিল ওর সঙ্গে কলকাতায় দেখা করতে। কেন দেখা করিনি! এখন কী করব! ধুৎ, কী পাগলামি! একবছর আগে দেখা হয়েছিল এখন গিয়ে বলা যায়, আমি এসেছি, এতদিনে আমার সময় হল!

কাগজটা কোটের পকেটেই রয়ে গেল। প্রত্যেক বছর প্রথম শীতে কোটের পকেট থেকে সবকিছু বার করি—অনেক পুরোনো কাগজপত্র বাতিল হয়ে যায়, ছিঁড়ে ফেলি, কিন্তু সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা ফেলতে ইচ্ছে করেনা। চোখ বুলিয়ে আবার রেখে দিয়ে ভাবি, থাক্-না। পড়ে-পড়ে কৃষ্ণার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার আমার মুখস্থ হয়ে গেছে—তবু ওর নিজের হাতের লেখাটা ফেলি না! এই একটা অদ্ভুত ব্যাপার—এই একটা বাড়ির ঠিকানা আমার মুখস্থ—যে বাড়িতে আমি কখনো যাইনি সাত বছর কেটে গেছে, আর কখনো যাবও না। কৃষ্ণার টেলিফোন নাম্বার আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে। অথচ ঐ নাম্বার কোনদিন আমি ডায়াল করিনি।

কত দরকারি ঠিকানা, কত গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নাম্বার ভুলে গিয়ে কত অসুবিধা হয়—কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় কৃষ্ণার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আমার স্মৃতিতে চিরস্থায়ী। এরকম অযৌক্তিক কাণ্ড করলে কি আর গল্প হয়?

বরং মাঝে-মাঝে ভাবি কৃষ্ণা তো একবার ভাবলেও পারত—ওর ঠিকানা-লেখা কাগজটা আমি হারিয়ে ফেলেছি—ওর ঠিকানা বা টেলিফোন নাম্বারটা আমার মনে নেই —সুতরাং ইচ্ছা থাকলেও আমি ওর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। কিন্তু ওকি আমায় একটা চিঠিও লিখতে পারত না? কিংবা টেলিফোন? এই ভেবে কৃষ্ণার ওপর প্রবল অভিমান হয় আমার।

৮

কইখালি পেরিয়ে এসেছে ওরা। এয়ারপোর্টের পিছনদিক ঘুরে এসে পড়েছে নতুন তৈরি হাইওয়ে পর্যন্ত। দমদম এয়ারপোর্ট থেকে এই হাইওয়ে সল্টলেকের পাশ দিয়ে চলে গেছে বেলেঘাটা পর্যন্ত, এখনও সম্পূর্ণ তৈরি হয়নি, মজুররা খাটছে। সেই চারজন বিশ্রাম নেবার জন্য হাইওয়ের ওপাশে গাছতলায় খাটিয়াটা নামাল। তারপর বিড়ি ধরাল।

মড়া বয়ে নিয়ে চলেছে, সেই কইখালি থেকে আসছে, যাবে বোধহয় নিমতলা ঘাট পর্যন্ত। দুপুরের রোদে এতখানি বয়ে নিয়ে যাওয়া কি সোজা কথা, এখন যিনি মড়া—সেই ভূতপূর্ব ভদ্রলোকটির শখ দেখলে আশ্চর্য লাগে, অথবা বোধহয় মৃতের আত্মীয়স্বজনেরই এই শখ। যদিও আত্মীয়স্বজন কেউ মড়ার সঙ্গে যাচ্ছে বলে তো মনে হয় না, বোধহয় পাড়াপ্রতিবেশী বা ভাড়াটে লোক দিয়ে কাজ সারছে। চারটে লোকের কোমরে গামছা বাঁধা, বোধহয় গাঁজা খেয়ে চোখ লাল, যে-কর্কশ সুরে বলহরি হরিবোল বলে চেঁচাচ্ছে, তাতেই বোঝা যায়, মৃত লোকটির সঙ্গে ওদের কোন আত্মীয়তা নেই। আত্মীযস্বজন বোধহয় আগেই গাড়ি চেপে শ্মশানে হাজির হয়েছে। এর বদলে, স্বগ্রামেই পুড়িয়ে গঙ্গায় শুধু অস্থি বিসর্জন দিলে তো হতো।

হাইওয়ে ধরে একদল লোক আসছে, তাই দেখে ঐ চারজন আবার 'বলহরি' রব তুলে খাটিয়া তুলল। একজন বলল, দেখিস একটু আস্তে, লাশ বড় দুলছে।

আরেকজন বলল, 'উঃ যা ভারী, মাইরি, লাশ একেবারে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে!'

—শুধু ফুলবে কেন, গোপেনবাবুর গতরটাও তো কম ছিল না।

চারজনেই একসঙ্গে হেসে উঠল। 'লে, লে, পা চালিয়ে চল। সন্ধের আগেই গঙ্গা পাইয়ে দিতে হবে।'

—বেরিয়েছিলাম বেশ ছায়ায়-ছায়ায়, আকাশে মেঘ ছিল। হঠাৎ এমন সুর্যি উঠে গেল! একেবারে কালঘাম ছুটিয়ে ছাড়ছে।

—গোপেনবাবুর যেমন ভাগ্য!

হাইওয়ে পেরিয়ে এসে এপারে বাগুইহাটির রাস্তা। এবার কোন্‌দিক দিয়ে যাবে, সেটা আলোচনা করার জন্য ওরা আবার খাটিয়া নামিয়ে জিরোতে বসল। নামাবার সময় বলল, 'দেখিস, সাবধানে। পা-দুটো না বেশি ঝুলে পড়ে!'

দুজনের মত হাইওয়ে ধরেই ফাঁকায়-ফাঁকায় বেরিয়ে গিয়ে একেবারে উল্টোডিঙ্গির ধার দিয়ে শহরে ঢুকবে। আর দুজন বলল, 'কেন বাগুইহাটি দিয়েই যাওয়া যাক্-না। বাগুইহাটির খাল পেরুলে সোজা রাস্তা ধরে যশোর রোড, সেখান থেকে শ্যামবাজার আর কতটুকু!'

--কিন্তু হাইওয়েটা বেশ ফাঁকা ছিল!

—আর রোদ যে চচ্চড় করছে! মড়া নিয়ে যাব তার আর ফাঁকা রাস্তা আর ভিড়ের রাস্তা কী? তুই মরলে তোকে নিয়ে যাব ফাঁকা রাস্তা দিয়ে, মরার পর তো শালা সবই ফাঁকা!

কয়েকবার জিরিয়ে-জিরিয়ে, ওরা চলে এল বাগুইহাটির খাল পর্যন্ত। একজনও বদলি নেই, ঐ-চারজন রোগা জিরজিরে লোক এতটা রাস্তা বয়ে আনতে হাঁপিয়ে গেছে একেবারে, কপালে ঘাম। তবু গলা ফুলিয়ে হাঁকছে, বলহরি হ-রি-বো-ল!

একজন পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়েছিলেন খালপারে, পাশ দিয়ে মড়া যেতে দেখে নাক কুঁচকে বললেন, 'ইস ডিউটিতে আসতে-না-আসতেই একটা মড়া দেখতে হল! একটু আস্তে চেঁচাও-না বাবা। ভগবান তো আর কানে কালা নন!'

একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছড়ি হাতে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। বাগুইহাটির খাল কচুরিপানায় ভর্তি, বেড়াবার পক্ষে খুব একটা আদর্শ জায়গা নয়। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই মতো ওঁরও দুটো উদ্দেশ্য থাকে সবসময়, ব্লাডপ্রেসার কমাবার জন্য একটু হাঁটাচলা, আর সেই ওপারের বাগুইহাটির বাজারটা দেখে আসা—ভালো কই মাছ উঠেছে কিনা। কিন্তু মাছের থলিটা নিয়ে বেরুতে পারেন না—ওপার থেকে থলি হাতে করে এলেই পুলিশ উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখে—ভেতরে চাল কিনা। এপার পর্যন্ত রেশনিং এলাকা, ওপারে খোলাবাজার, পোলের পাশে পুলিশের ছাউনি।

মড়া দেখে তিনি ছড়িশুদ্ধ হাত তুলে নমস্কার করলেন। তারপর জিজ্ঞেস

করলেন, 'কে মায়া কাটাল? মেয়ে না পুরুষ?'

—পুরুষ।

—কোথা থেকে আসছ ভাই তোমরা? কোন পাড়ার?

—কইখালি।

—কইখালির কে?

—গোপেন সাহা।

—অ্যাঁ! গোপেন সাহা! কবে মরল।

—সাহা কে বলল? গোপেন সান্যাল।

—গোপেন সাহা আমার বহুকালের বন্ধু। ওয়ারটাইমে তার সঙ্গে আমি সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টে একসঙ্গে কাজ করেছি! শরীরটা তার খারাপ যাচ্ছে শুনেছিলাম। একবার নামাও তো, মুখটা দেখে নি।

—বললাম তো অন্য লোক। সাহা নয়, সান্যাল!

—বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। একবার নামাও-না, দেখে সন্দেহটা মিটিয়ে নিই। অন্যলোক হলে তো ভালোই।

—এখন নামানো হবেনা। পা চালিয়ে চল!

—এক মিনিটে কী এমন অনর্থ হয়ে যাবে? বুড়ো মানুষকে শুধু-শুধু চমকে দিলে। একটু নামিয়েই দেখাও-না!

—পা চালিয়ে চল-না। বেলা পড়ে এল।

ক্যালভার্টে কয়েকটা ছেলে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। লোক-চারজন মড়ার খাটিয়া নিয়ে প্রায় ছুটছে দেখে, তারা দৌড়ে এসে ওদের ধরল। জোর করে খাটিয়া নামাল। সরিয়ে ফেলল ওপরের কাপড়। মাথার কাছে একটা পরচুলো দেওয়া মুখোশ, পায়ের কাছে দুটো নকল মাটির পা। শরীরের জায়গায় ছবস্তা চাল ঠাসাঠাসি। মৃতদেহ নেই, সেখানে মানুষকে বাঁচাবার বস্তু।

হৈ হৈ, পুলিশ ডাকা, ভিড়। এই ছেলেগুলোই আজকাল চোরাকারবারী ধরার জন্য খুব সজাগ। অনেকসময় ওরাই রিকশা কিংবা গোরুর গাড়ি সার্চ করে—পুলিশ না-থাকলে, এমনকী লোকের বাজারের থলি কিংবা ডাক্তারের ব্যাগ পর্যন্ত, দৈবাৎ চাল পেয়ে গেলে পুলিশ ডাকে। পুলিশের দারোগা ছুটে এসে হুইসল বাজালেন, চারজন কনস্টেবল ছুটে এল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওদের ধরা গেলনা। হঠাৎ তিন-চারটে কুকুর ঝগড়া করতে-করতে এসে ভিড়ের মধ্যে পড়তেই, ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, সেই চারজন লোক সেই ফাঁকে ছুট দিল প্রাণপণে—দক্ষিণপাড়া পেরিয়ে কেষ্টপুর দিয়ে কোথায় পালিয়ে গেল। ওদের ধরা গেল না কিন্তু বামাল গ্রেফতার হল। ভিড়ের অনেকেই

চিনতে পেরেছে—ঐ-চারজন নাকি পাকা চোরাচালানি।

এই ঘটনা আমি শুনি লোকমুখে। চাল পাচার করার এই অদ্ভুত গল্পটি লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর থেকে প্রত্যেকটি শ্মশানবন্ধু দলেরই খাটিয়া নামিয়ে মড়া চেক করে দেখা হতে লাগল।

কিন্তু এর পরবর্তী ঘটনা আমার নিজের চোখে দেখা। বাগুইহাটির বাজারে আমিও মাঝে-মাঝে কইমাছের খোঁজে যাই। দিন দশেক পরে, আমার চোখের সামনেই সেই অদ্ভুত কাণ্ডটি ঘটল।

খাটিয়ায় চাপিয়ে চারজন লোক মড়া নিয়ে আসছে। কালভার্টে সেইরকম কয়েকজন যুবক বসে। খালপারে পুলিশের দারোগা। হঠাৎ যুবক কয়েকজন বলে উঠল, 'আরেঃ!'

তারা বিস্ময়ে উঠে দাঁড়াল। সেই আগের চারজন লোকই আবার একটা খাটিয়া নিয়ে আসছে। এ-ও কখনও সম্ভব, ওরা এত বোকা হতে পারে? যুবকরা বলল, 'সেই চারজন, আমার স্পষ্ট মনে আছে, ঠিক সেই চারজন।'

আরেকজন বলল, 'না, ঠিক সেই চারজন নয়। তার মধ্যে তিনজন। আমার ভালো মনে আছে। সেই চারজনের তিনজন আর একটা লোক নতুন। ঐ গাট্টাগোট্টা লোকটা আগেরবার ছিলনা। কী ব্যাপার?'

দারোগা সাহেব পর্যন্ত চিনতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছেন। তিনি কোমরে হাত দিয়ে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে রইলেন ওদের প্রতীক্ষায়। লোকগুলো তীব্র স্বরে বলহরি ধ্বনি দিতে-দিতে কাছে এগিয়ে এল। এতগুলো উৎসুক চোখের সামনে এসে ওরা দাঁড়াল, কিছুই বলতে হল না, খাটিয়া নামিয়ে রাখল। গাট্টাগোট্টা নতুন লোকটা নিজেই ওপরের কাপড় সরাল। সত্যিই একটা মৃতদেহ। একটা রোগা শুটকো লোক মরে আছে। ওদের একজন বলল, 'দেখুন, চাল নেই, সত্যিকারের মড়া। চাল নেই, দেখুন!'

আমিও উঁকি মেরে দেখলাম। খুনটুন পর্যন্ত নয়, সাধারণভাবে একটা লোক মরেছে। ভিড়ের মধ্যে একজন অস্ফুটভাবে বলল, 'এই সেই চারনম্বর লোকটা।'

৯

ঠিক বিকেল পাঁচটা বেজে পনেরো মিনিট, আউট্রাম ঘাটের সামনে যে-মূর্তি তার ডানদিকের কোণ ঘুরে আসবে একটি মেয়ে, মেয়েটির পরনে একটি বোম্বাই

ছাপাশাড়ি, পায়ে গোলাপি রঙের 'লাকি' চটি, চুল বিনুনি-করা নয়, এলোখোঁপা, মেয়েটির হাতে থাকবে লাল রঙের হাতব্যাগ।

আর ঠিক সেই সময়েই ঐ মূর্তিটার দিক থেকে অকস্মাৎ বাঁক নেবে একটি ছেলে, ছেলেটির পরনে চওড়া-পাড় ধুতি এবং মুগার পাঞ্জাবি, মাথার চুল একটু কোঁকড়া, হাতে থাকবে ডি এইচ লরেন্সের কাব্যসংগ্রহ (পেপারব্যাক)।

ছেলেটি এবং মেয়েটি ঠিক পাঁচটা পনেরোয় ঐ মূর্তির দুপাশ দিয়ে এসে মুখোমুখি হবে। ছেলেটি বলবে, আরেঃ! কিন্তু মেয়েটির উদ্দেশ্যে নয়। মেয়েটির পিছন-পিছন আসা একটি মাঝবয়সী ভদ্রলোকও এইসময় বলবেন, আবেঃ! যদিও আগে থেকেই জানা, কিন্তু দুজনকেই আরেঃ! বলতে হবে যথোচিত বিস্ময় ফুটিয়ে। তারিখ, কোন এক রবিবার।

ওরা থমকে দাঁড়াবে। ভদ্রলোকটি এগিয়ে এসে যুবকটির কাঁধ চাপড়ে সোল্লাসে বলবেন, কী খবর! বহুকাল পর দেখা। আলাপ করিয়ে দি, এই আমার ভাগনি, অরুণা, অরুণা রায়, এখন স্কটিশে বি.এ. পড়ছে। আর, অরুণা, এ হচ্ছে সুবিমল সান্যাল—আমার অনেককালের চেনা। মেয়েটি রক্তিমগণ্ডে হাত তুলে নমস্কার করবে আলতোভাবে—ততক্ষণে ছেলেটির নমস্কার সারা হয়ে যাবে।

ঐ-যে ভদ্রলোকটি সুবিমল সান্যালের কাঁধ চাপড়ে বহুকাল পরে দেখা হবার জন্য পুলক সোচ্চার করলেন, তিনি অবশ্য সুবিমলকে কস্মিনকালেও চেনেননা, আগে কখনও দেখেননি। তবু তিনি বলবেন, এসো সুবিমল একটু চা-খাওয়া যাক। তাড়া নেই তো তোমার? আরে, অরুণার সামনে অত লজ্জা করছ কেন, অরুণা খুব স্মার্ট মেয়ে, কলেজে কত ডিবেট করেছে।

তারপর—

এখানেই স্বীকার করা ভালো, আমি রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর লেখা একেবারেই লিখতে পারিনা। ঘটনার সাসপেন্স শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। খালি মনে হয়, শেষটা আগে বলে ফেলি, পাঠক আমার চেয়ে ঢের বুদ্ধিমান, সে বহু আগেই বুঝে ফেলে আমার বোকামির প্রয়াস দেখে হাসছে। কোন-এক রবিবার আউট্রাম ঘাটে পাচটা পনেরোয় কী-কী ঘটবে—তা আমি আগে থেকেই কী করে জানলাম, সেই কারণটাই বলি আগে।

কারণ খুব সোজা। সুবিমল আমার কাছে এসেছিল। সুবিমলের বিয়ে হবার কথাবার্তা চলছে। ওর বাড়ির লোক উনচল্লিশ জায়গায় পাত্রী দেখে, শেষ পর্যন্ত অরুণা রায়কে প্রায় পাকা পছন্দ করেছে। অন্যান্য জরুরি বিষয়েও মতের মিল হয়েছে দুপক্ষের। কিন্তু সুবিমল আধুনিক ছেলে, সে প্রেম করে অসবর্ণ বিবাহ করতে পারেনি বটে, কিন্তু একবারে চোখে না-দেখে বাপ-মায়ের কথা শুনেই

একটা অচেনা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলবে —এত কাঁচাও সে নয়। এ-বিষয়ে সে-বাড়িতে একটা বিদ্রোহই করেছে বলা যায়। অথচ, পাত্রীপক্ষের বাড়িতে গিয়ে ফরাসে বসে একটি লাজুক-লাজুক মেয়েকে দেখা—এ-প্রাচীন প্রথাতেও তার মত নেই। এতে নাকি নারীত্বের অবমাননা না কী-যেন হয়।

সুতরাং এই অভিনব পরিকল্পনা। পরিকল্পনাটা সুবিমলেরই। রাত্রে শুয়ে-শুয়ে এই পরিকল্পনাটা তৈরি করে সুবিমল নিজের বুদ্ধিতে কীরকম খুশি হয়েছে বুঝতে পারি। সুবিমল আমাকে বলল, এর মধ্যে খারাপ কিছু আছে, বল? সহজ-সরলভাবে আলাপ-পরিচয় হবে—দুজনেই দুজনকে জানতে পারব আগে থেকে!

যাইহোক, বন্দোবস্ত সব ঠিকঠাক। ডুয়েল লড়ার সময় যেমন একজন 'সেকেন্ড ম্যান' লাগে সেইরকম, সুবিমল আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চায়।

আধুনিক হবার প্রাণপণ চেষ্টায় সুবিমল হয়তো শেষপর্যন্ত একটা 'প্রেম' করে বিয়ে করার চেষ্টাই করে যেত, কিন্তু ইতিমধ্যে ও একটা ভালো সরকারি চাকরি পেয়েছে, এবং বছর না-ঘুরতেই, ওকে ট্র্যান্সফার করেছে দুমকায়। সেই নির্জন জায়গায় কী করে একা-একা থাকবে--সেইজন্যই ওর বাবা-মা বিয়ের জন্য জোর করেছেন। সুবিমলও মত না-দিয়ে পারেনি।

আমি শুনে প্রচণ্ড খুশিতে হো-হো করে হেসে উঠে বললাম, 'বাঃ, এ-তো চমৎকার ব্যাপার, মাইরি! বল, বল, তারপর কী হবে? মেয়েটা কি আগে থেকেই তোর পরিচয় জানবে?'

—জানাব তো কথা নয়। যদি না, নিজে গোপনে জেনে থাকে। মেয়েদের কৌতূহল তো জানিস!

—মনে কর ঐ সময়টাতেই যদি বাইচান্স আর-একটা তোরই মতো বা তোর চেয়েও ভালো চেহারার ছেলে এসে পড়ে—তবে ঐ মামা ভদ্রলোক তাকেই সুবিমল বলে পিঠ চাপড়াবে? ভদ্রলোক তো তোকে কখনো দেখেননি।

—ছবি দেখেছেন।

—বাঃ! সময়টাও বেছে নিয়েছিস চমৎকার! পাঁচটা পনেরো—পাঁচটা নয়, সাড়ে পাঁচটাও নয়—তাহলে প্ল্যান ধরা পড়ে যেতে পারত! তাছাড়া, শীতকালের ঠিক ঐ-সময়টাতেই কনে-দেখা-আলো পড়ে, নারে?

সুবিমল এবার একটু লজ্জা পেল। আমি বললাম, 'যদি এই মেয়েকেই তোর পছন্দ হয়—তবে ফুলশয্যার রাত্রে এই ঘটনাটা নিয়ে তোরা দুজনে খুব হাসাহাসি করতে পারবি। আচ্ছা বল, তারপর কী কী হবে?' চা-খেতে তো বসা হল, বুঝলাম —কথাবার্তা কীরকম হবে?

—তারপর আর-কিছু ঠিক করা নেই। কথাবার্তা যে-ভাবে এগোয় আর-কী।

হঠাৎ দেখা হলে লোকে যা কথা বলে আর-কী!

—যাঃ! আমাকে তো সব জেনে রাখতে হবে! আমি যাতে আবার কোন বেফাঁস কথাবার্তা না-বলে ফেলি! আমার বোধহয় বেশি কথা বলাও ঠিক হবেনা। তাহলে না শেষকালে মেয়েটির আমাকেই পছন্দ হয়ে যায়। আমাকে একটু গম্ভীর প্রকৃতির লোক সাজতে হবে। তোর ভয় নেই, আমি ভুরু কুঁচকে নাকটা বেঁকিয়ে আমার মুখটা যতদূর সম্ভব কুচ্ছিৎ করে রাখব আগাগোড়া। কথাবার্তা কী বলবি বল, তুই নিশ্চয়ই কিছু ভেবে রেখেছিস।

সুবিমল হেসে বলল, 'যাঃ, আগে থেকে ভেবে কোন কথা বলা যায়না।'

আমি বললাম, 'কথাবার্তা কীরকম হবে আমি কল্পনা করতে পারি। মামা ভদ্রলোকটি পাকেচক্রে তোর চাকরির কথা জিজ্ঞেস করবে। তুই মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবি তার কলেজের কথা। কোন-কোন সাবজেকট বেশি ভালোবাসে। এম.এ. পড়ার ইচ্ছে আছে কিনা। মাঝখানে একবার, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে, গঙ্গানদীতে চড়া পড়ে যাওয়ার সমস্যা আর সি এম পি ও'র দ্বিতীয় ব্রিজ বানাবার পরিকল্পনা নিয়ে কথা হয়ে যাবার পর—তুই তোর হাতের লরেন্সের কাব্যসংগ্রহটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে-করতে একফাঁকে অরুণা নাম্নী মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করবি, লরেন্সের কবিতা তার ভালো লাগে কিনা। মেয়েটি জানাবে, সে লরেন্সের 'রকিং হর্স উইনার' নামে একটি গল্প পড়েছে, ('লেডি চাটার্লিস লাভার' পড়ে থাকলেও বলবেনা)—তুই লরেন্সের যে-কোন একটা কবিতার চার-পাঁচলাইন চেঁচিয়ে পড়ে বলবি, আঃ, এটা পড়ে দেখুন, কী চমৎকার কবিতা। ঐ-ফাঁকে তোর দেখে নেওয়া উদ্দেশ্য, মেয়েটির ইংরেজি উচ্চারণ কেমন। কারণ, অফিসারের বউদের নানা পার্টিতে যেতে হয়—ইংরেজিটা একটু ভালো জানা দরকার!'

সুবিমল বলল, 'যাঃ, তুই বেশি ইয়ার্কি করছিস। রবিবার ফ্রি আছিস কিনা বল।'

আমি বললাম, 'সুবিমল, তুই একটা গাধা!'

—বিয়ের আগে সবাইকেই গাধা-গাধা দেখায়!

—তুই ব্ল্যাকমার্কেট করছিস কেন?

—ব্ল্যাকমার্কেট?

—তাছাড়া কী? ঠিকঠাক করা বিয়েকে তুই প্রেমের বিয়ে বলে চালাতে চাস! যেন এক সন্ধেবেলা দুজনেরই দুজনকে গভীর পছন্দ হয়ে গেল! তোর বাবা অবশ্য পণ নেবেননা জানি, বউভাতের খরচ বলে হাজার চারেক টাকা নিতে পারে! দানসামগ্রী নিয়ে কোন কথাই উঠবেনা, সে তারা মেয়েকে যা ভালো বোঝেন দেবেন। অবশ্য, তোর হাতঘড়িটা যে খারাপ হয়ে গেছে, সে-কথাটা কোনক্রমে

ওঁরা জেনে যাবেনই। আর দুমকাতে গিয়ে নতুন সংসার পাততে হবে—সেজন্য আসবাবপত্র যদি মেয়ের মা মেয়ের জন্য শখ করে কিনে দেন, তাতে কার কী বলার আছে?

—তুই ঠাট্টা করছিস, কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়।

—জানি। সকলেই বিদ্রোহী নয়। বিদ্রোহী সাজাও যায়না। মূর্তিমান উগ্র আধুনিক যখন একটি শাড়ি পরানো টাকার পুটলিকে বিয়ে করে, তখন সে বন্ধুদের কাছে কাঁচুমাচুভাবে বলে, কী করব ভাই—মা বুড়ো হয়েছেন, মায়ের ইচ্ছে—। কথাটা সম্পূর্ণ মিথ্যেও নয়। মা যদি অবুঝও হন, তবু তোকে দুঃখ দিয়ে ক'জন বিদ্রোহ করতে পারে, জানিনা। আমি তোকে সে-কথা বলছিও না।

—তুই জানিস না, আমি মা-বাবাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলাম। তাছাড়া বাড়ির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব, কার জন্য? সেরকম মনের মতো মেয়ে পেলাম কোথায়? মনের মতো দূরের কথা, এই তিরিশ বছরের জীবনে একটা মেয়ের সঙ্গে তেমনভাবে আলাপই হল না। অথচ আমি মোটামুটি সুস্থ-স্বাভাবিক ছেলে! তোর যে-সমাজ পণপ্রথা ওঠাতে চায়, জাতিভেদ, কাস্টসিস্টেম ঘোচাতে চায়—সে-সমাজ ছেলেমেয়েদের সহজভাবে মেলামেশা করার সুযোগ দিয়েছে? খুব তো বিদ্রোহ-ফিদ্রোহ বড়-বড় কথা বলছিস! একটা ভিন্নজাতের মেয়েকে বিয়ে করে যে বাড়ির গোঁড়ামি ভাঙব—সেরকম একটা মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল কোথায়? ওসব বড়লোকদের মধ্যে হয়—অথবা কবিটবিদের, আমরা মেশার সুযোগ পেলাম কোথায়? একটা মেয়ের সঙ্গে একটু একা কথা বললেই তো—অমনি সবার ভুরু কুঁচকে উঠল! তাই শেষ পর্যন্ত ভাবলাম, দূর ছাই!

—তুই যা করছিস তাতে আমি কোনই আপত্তি করিনি। আমি শুধু বলছি ইস্কাবনকে ইস্কাবন বলে ডাকতে। ঠিক করা বিয়ে যখন হচ্ছে, তখন পুরোপুরিই হোক! চল, আমরা মেয়ে দেখতে যাই মেয়েরই বাড়িতে। ফরাসের ওপর বসে লুচি-সন্দেশ সাঁটতে-সাঁটতে পাত্রীকে বলব, একটু হাঁটো তো মা! হারমোনিয়ামে রবীন্দ্রসংগীত শুনি। চুলের গোছায় হাত দিয়ে দেখি মোজা লুকোনো আছে কিনা! ভূদেব মুখুজ্যের লেখা থেকে ডিকটেশান দিয়ে হাতের লেখা দেখব, জিজ্ঞেস করব নেপোলিয়ানের ছোট ছেলের জন্মসাল। কলেজে ডিবেট-করা মেয়ে যখন বাপ-মায়ের কথাতেই বিয়ে করছে, তখন সে এসবও করতে বাধ্য।

সুবিমল আমার দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকাল আমার মতলব বোঝার জন্য। আমাকে তখন বক্তৃতায় পেয়ে বসেছে। আমি বললাম, 'তুই পণই-বা নিবিনা কেন? তুই ইস্কুলে 'পণপ্রথার কুফল' সম্পর্কে রচনা লিখে ফার্স্ট হয়েছিলি, তাতে কী হয়েছে? যে-ছেলে অসুখের সময় বার্লি খেতে একেবারেই পছন্দ করতনা,

সে যেমন পরে ডাক্তার হয়ে আবার সব ছোটি ছেলেকে বার্লি খেতে বলে, কিংবা, প্রবীণ লেখকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে যে-নবীন লেখক—সেই যেমন এক সময় প্রবীণ হয়ে পরবর্তী নবীনদের দুচক্ষে দেখতে পারেনা, কিংবা ট্রেনের কামরায় খুব ভিড়—একজন লোক উঠতে পারছে না —কামরা শুদ্ধু লোক বলছে জায়গা নেই জায়গা নেই—খুব কাকুতি-মিনতি করে উঠে আসার পর—সেই লোকটাই যেমন পুরের স্টেশনে লোকদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ওইরকম আরেকটা লোককে বলে জায়গা নেই, জায়গা নেই—সেই একই যুক্তিতে তুইও ঠিক করছিস।'

বলাই বাহুল্য, সেই রবিবার সুবিমল আমাকে সঙ্গে নেয়নি। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, অরুণা রায় নাম্নী মেয়েটির সঙ্গে সুবিমলের বিয়েও হয়নি। সুবিমল যে তাকে পছন্দ করেনি তা নয়। কিন্তু পাকা দেখার দু-একদিন আগে স্কটিশচার্চ কলেজের একটি ছেলের চিঠি আসে তার কাছে, সুবিমল যদি অরুণাকে বিয়ে করে, তবে সেই ছেলেটি নাকি আত্মহত্যা করবে! ফলে সুবিমল অরুণার চরিত্রে সন্দিহান হয়ে, আর-একটি ম্যাট্রিক পাশ—কলেজে-না-পড়া মেয়েকে দ্রুত বিয়ে করে ফেলল। সেই বিয়েতে গতকাল আমি চানাচুর, কাটলেট এবং মুগের ডালের সন্দেশের নেমন্তন্ন খেয়ে এলাম।

১০

সেলুনটাতে বেশ ভিড়, আটটি চেয়ারে আটখানা কাঁচি খচাখচ শব্দ তুলে ব্যস্তভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আরও পাঁচ-ছয়জন মাথার খদ্দের প্রতীক্ষমাণ, আমিও তাদের মধ্যে একজন। সেলুনে চুল কাটার সময়টুকুই তেমন সুন্দর নয়, তার ওপর আবার অপেক্ষা করা—কিন্তু আমি বসেই রইলাম, কারণ আজ যখন ঠিক করে বেরিয়েছি, আজই চুকিয়ে ফেলব ঝামেলা।

ডাক্তারখানার মতন, আজকাল সেলুনেও পত্রপত্রিকা রাখা হয়। খান-কয়েক মেয়েদের ফ্যাশন পত্রিকা ও একটি ইংরেজি সচিত্র সাপ্তাহিক। যতদূর জানি, মেয়েদের চুল-কাটা বা দাড়ি কামাবার দরকার হয় না, এসব সেলুনে তারা কখনো আসবে না, তবু এখানে মেয়েদের ফ্যাশন পত্রিকা রাখার কী মানে হয় জানিনা। আর ঐ ইংরেজি সচিত্র সাপ্তাহিকটিও প্রায় মেয়েদেরই কাগজ। বেশ পুরোনো সংখ্যা, বোধহয় সের দরে কিনেছে।

ঐ পত্রিকাগুলো আমি স্পর্শ করলাম না, দুখানা ইংরেজি-বাংলা খবরের কাগজ ছিল, সেই দুটোই আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করতে লাগলাম।

ছেলেবেলায় 'ইটালিয়ান' সেলুনে বসে খবরের কাগজের জামা পড়ে যখন চুল কাটতাম, তখন পরামানিকদের সঙ্গে বেশ মধুর সম্পর্ক ছিল। চুল কাটতে-কাটতে অনেক গল্প হতো, সময়টা এত লম্বা মনে হতোনা। সংস্কৃত সাহিত্যে নরসুন্দর বা পরামানিক বা নাপিতদের খুব ধূর্ত বলা হয়েছে বারবার। অন্তত বাকচতুর। এখনকার সেলুনে অবশ্য সে-পরিচয় পাওয়া যায়না। এখন যাঁরা ঝকঝকে-তকতকে সেলুন খুলে চুল কাটার ব্যাবসা নিয়েছেন, তারা ভদ্র ও গম্ভীর, খদ্দেরদের সঙ্গে শুধু 'ঘাড়টা তুলুন' কিংবা 'জুলপি কি লম্বা হবে স্যার?' এই ধরনের কথা ছাড়া আর কোন কথা হয়না। চুল কাটার সময়টা আজকাল তাই এত বিরক্তিকর।

অবশ্য নিজেদের মধ্যে কথা বলতে কোন বাধা নেই। কাঁচি খচখচ করতে-করতে কিংবা ক্ষুর ঘ্যাসঘ্যাস করতে-করতে একজন আর-একজনকে জিজ্ঞেস করতে পারে, 'যদুদা, আজ তোমার ক'টা মাথা হল? আমার তো আজ শুধু ক্ষুরের কাজ, কেইচি ধরতেই পারলামনা' ইত্যাদি।

সেলুনের একজন কর্মচারীর বয়েস পনেরো-ষোলো। সে এখনও পুরোপুরি নরসুন্দর হয়ে ওঠেনি। সে ব্রাশে সাবান মাখিয়ে দেয়, ক্ষুর সাফ করে, কাটা চুল পরিষ্কার করে। অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট। তাকে তার একজন সিনিয়ার কোলিগ জিজ্ঞেস করল, 'এই হরেন্দর আজ তোর দুপুরেও ডিউটি, খেয়ে এসেছিস তো?'

ক্লিপ থেকে ফুঁ দিয়ে চুল বার করতে-করতে হরেন্দ্র বলল, 'হ্যাঁ। রোজই তো আমার ন'টার মধ্যে খাওয়া হয়ে যায়।'

—রোজ ন'টায় খাস? আর রাত্তিরে খাস কখন?

—ন'টা-দশটায়!

—দুপুরে কিংবা বিকেলে খিদে পায়না?

—চা খাই যে? চা খেলে আর খিদে পায়না।

—কে রান্না করে?

—বাবা।

—বাবা কেন? মা করেনা?

—মা কাজ করতে যায়—

কথাবার্তাগুলো একঘেয়ে ধরনের। অর্থাৎ কথার জন্যই কথা বলা। যে জিজ্ঞেস করছে এবং যে উত্তর দিচ্ছে, কারুরই বিশেষ মন নেই। কিন্তু আমাকে শুনতে হবেই, মানুষের কান তো আর বন্ধ করা যায়না।

—আজ কী খেয়েছিস?

—আলুসেদ্ধ আর ভাত।

—আর?

—কাঁচালঙ্কা।

—ডাল ছিলনা? মাখলি কী দিয়ে?

—ফ্যানাভাত তো, মাখব আবার কী?

হঠাৎ আমার একটু হাসি পেল, অকারণেই বলা যায়। হাসি লুকোবার জন্য আমি সিগারেট ধরিয়ে মুখটা ফেরালাম। এক্ষুনি ইংরেজি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন পড়ছিলাম। 'A course in Mughlai dishes for house-wives. Fee rupees 75/ contact Mrs...'

মিসেস অমুক গৃহস্থ বধূদের মোগলাই রান্না শেখাবেন পঁচাত্তর টাকা ফি নিয়ে। আমি ভাবতে লাগলাম, মোগলাই রান্না শেখানো হবে কী পদ্ধতিতে? রেডিওতে রান্না শেখাবার মতন, এবার মাখন দিয়ে মাংসগুলো ভাজুন, চাকাচাকা করে পেঁয়াজ কেটে আদার রসে ভিজিয়ে... একজন এরকম বলে যাবে আর গিন্নীরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনবে? নাকি সত্যি-সত্যি মাছ-মাংস—পোলাউয়ের চাল—ঘি-গরমমশলা এসব এনে হাতে-কলমে শেখানো হবে? কে আনবে সেগুলো, ছাত্রীরাই? নাকি মাস্টারনীই সেগুলো সরবরাহ করবেন! মাত্র পঁচাত্তর টাকা ফি-তে কি অতসব হয়? রান্না হয়ে গেলে কি নিজেরাই সেখানে বসে খাবে, না বাড়িতে নিয়ে যাবে? খাঁটি মোগলাই রান্নায় তো শুনেছি আসল জাফরান, মুক্তাভস্ম, একবারও ডিম পাড়েনি এমন মুর্গির মাংসটাংস লাগে, সেসব জোগাড় হবে কোথা থেকে?

হরেন্দ্র ছেলেটির স্বাস্থ্য কিন্তু খারাপ নয়, বেশ গড়াপেটা। কালো রং, কিন্তু তেলচকচকে। মুখখানা হাসিখুশি। আজকাল খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে অনেকেই খুব ভাবে। কারবোহাইড্রেট, প্রোটিন, ক্যালসিয়াম, আয়রন, ভিটামিন—এসব মিলিয়ে একটা ব্যালানসড ডায়েট খাওয়া দরকার। আর হরেন্দ্র খাচ্ছে ফেনাভাত আর আলু—দুটোই তো স্টার্চ না কারবোহাইড্রেট কী যেন, প্রোটিন-ফ্রোটিনের নামগন্ধ নেই—কিন্তু ওর তো দিব্যি স্বাস্থ্য। বিজ্ঞানের অনেককথাই স্রেফ গাজাখুরি!

কথাবার্তা আরও অনেকদূর গড়িয়েছে। হরেন্দ্র চটপট করে কাজ সারছে আর কথার জবাব দিচ্ছে।

—তোরা এখনও সেই ঘরেই আছিস? কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছিলনা?

—ওখানে আর নেই। ও লোকটা বড্ড হারামি! (হারামি শব্দটা হরেন্দ্র উচ্চারণ করল অম্লান মুখে, গালাগাল বলে মনেই হলনা) রোজ খিটিমিটি-খিটিমিটি—এখন আমরা রেললাইনের ওধারে বস্তিতে একটা ঘর নিয়েছি।

—কত ভাড়া?

—সতেরো—

—সতেরো? আগেরটা পনেরো ছিলনা? এই বাজারে দুটাকা খরচ বাড়ালি?

আবার আমার হাসি পেল। চোখের সামনেই ইংরেজি কাগজে আর-একটি বিজ্ঞাপন,

A luxurious western style ground-floor flat, three bed-rooms with attached bath-rooms, dining and launge space—rent Rs. 1,800/-.

এইসব ভালো-ভালো বিজ্ঞাপন দেখলে শুধু হাসি পায়না, সিটি দিতে ইচ্ছে করে। তিনখানা শয়নকক্ষের ভাড়া আঠারোশো টাকা! অফিসটফিস নয়, মনুষ্যবাসের জন্যই, কেননা, স্পষ্ট লেখা আছে 'বেডরুমস'। এই এক ধাঁধা। কাগজে এরকম বিজ্ঞাপন প্রায়ই দেখি। আঠারোশো টাকা দিয়ে যে-লোক ফ্ল্যাট ভাড়া নেবে, তার রোজগার কত? সে নিজেই একটা বাড়ি বানিয়ে ফেলে-না কেন?

ইচ্ছে হল, ফ্ল্যাটটা একদিন দেখে আসব। ভাড়া নিই-না-নিই, দেখতে দেবে নিশ্চয়ই। দেখতে চাই, ঐ ফ্ল্যাটের মেঝেগুলো সোনারুপো দিয়ে তৈরি কিনা! এর আগে তিন হাজার টাকা ভাড়ায় একটা ফ্ল্যাটের বিজ্ঞাপন চোখে পড়েছিল, সেই ফ্ল্যাটটা না-দেখে খুব মিস করেছি! 'ওয়েস্টার্ন স্টাইল'—সেটাও কী ব্যাপার দেখে আসা মন্দ কী?

গ্রাউন্ডফ্লোর ফ্ল্যাট যখন বলেছে, তখন বাড়িটার নিশ্চয়ই আরও দু-তিনটি তলা আছে। দোতলা-তিনতলার ফ্ল্যাটগুলোও কি ঐরকম, না আরও বেশি ভাড়া? যদি তিনখানা ফ্ল্যাট থাকে, তাহলে বাড়ির মালিকের আয় মাসে চুয়ান্নশো টাকা। আর ঐরকম বাড়ি যার, সে কি শুধু একটাই বাড়ি বানিয়েছে? যাকগে, ওসব বড়-বড় ভাবনা।

বাংলা কাগজে পড়লাম, কোথায় যেন একজন জোতদারকে খুন করা হয়েছে গতকাল। দেশটা প্রায় নাগাল্যান্ড হয়ে উঠল। দুশো বিঘে জমি বেআইনিভাবে দখলে রেখেছিল নাকি জোতদারটি। দুশো বিঘে জমি থেকে বছরে কত আয় হয়, আমি জানিনা। তবে জোতদারটিকে খুব বুদ্ধিমান বলা যায়না। ঐসব জমিজমা বিক্রি করে কলকাতায় একখানা এই বিজ্ঞাপনের মতন 'ওয়েস্টার্ন স্টাইল' ফ্ল্যাটবাড়ি হাঁকিয়ে বসলেই পারত! অবশ্য দুশো বিঘে জমি বেচে কলকাতায় ছোটখাটো বাড়িও হতো কিনা জানিনা।

চুল কেটে বেরুতে আমার বেশ দেরি হয়ে গেল। একটা জায়গায় আমার খুব জরুরি যাওয়ার দরকার ছিল। ট্রামে-বাসে দারুণ ভিড়, তার ওপর এইরকম গরম। ধৈর্য রাখা গেলনা, ঝট করে একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফেললাম। পনেরো পয়সায় যেখানে যাওয়া চলত, সেখান চারটাকা খরচ হয়ে গেল। মনে পড়ল, মাসে দুটাকা

ঘর ভাড়া বেড়েছে বলে হরেন্দ্র ও তার সহকর্মী পনেরো মিনিট ধরে আফসোস করেছে। একটু খচমচ করল ভেতরটা, মনে হল, আমিও অপরাধী।

১১

কথার মাঝখানে যদি হঠাৎ টিকটিকি ডেকে ওঠে টিকটিক করে, তাহলে নাকি সে-কথাটা নির্ঘাৎ সত্যি হয়, ঠিক-ঠিক ফলে যায়। এই সংস্কারের মধ্যে যদি কিছুটাও সত্যি থাকে, তবে বলতে হবে, আমাদের বাড়ির সকলেই পরম সত্যবাদী। সকলেই প্রবক্তা। কারণ, আমাদের বাড়িতে যে-কোন কথার মধ্যেই অনবরত টিকটিকি ডেকে উঠছে টিকটিক-টিকটিক করে।

এত টিকটিকি কোথা থেকে এল কে জানে। যখনই তাকাই, দেখি দেওয়ালের কড়িকাঠে অন্তত পাঁচ-ছটা নিস্পন্দ হয়ে পড়ে আছে। ঠাণ্ডা চোখ মেলে যে কে কোনদিকে তাকিয়ে আছে, বোঝার উপায় নেই।

টিকটিকির মতো এমন রহস্যময় জীব আমি দেখিনি। আজকাল টিকটিকির ভাবনায় আমার বহু সময় কেটে যাচ্ছে। হুবহু কুমিরের মতো দেখতে, কিন্তু কুমিরের চেয়ে অনেক উঁচুজাতের জীব এরা। যেমন বিড়ালকে যদিও বাঘের মতোই দেখতে, কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা, বিড়াল বাঘের চেয়ে অনেক বুদ্ধিমান জীব। প্রথমত এরা মানুষের সংস্পর্শে থাকে। যাইহোক, টিকটিকি বিষয়ে দুটো সমস্যার কোন মীমাংসা আমি আজ পর্যন্ত করতে পারিনি। কারণ ওদের শরীরে কি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কাজ করেনা? খাড়া দেওয়ালে ওরা থাকে কী করে? যতই ছোট হোক, ওদেরও শরীরের তো ওজন আছে? এর উত্তরে আমার এক বন্ধু বললেন, ওদের চারহাতে (অথবা চারটেই পা) নাকি এক ধরনের আঠা মাখানো থাকে। কিন্তু আমার বিশ্বাস হলনা। আঠা লাগানো থাকলে দেয়ালের গায় আটকে থাকতে পারে ঠিকই কিন্তু ছোটে কী করে? শুধু দেয়াল বেয়ে নয়, দেয়ালটা তবু মানা যায় —আমরা যেমন তালগাছে উঠি, কিন্তু ঘরের সিলিং-এ শরীরটা সম্পূর্ণ উল্টো করে কী করে ছোটে? আর কী বিদ্যুৎবেগে ছোটা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিকটিকি যেমন চুপ করে পড়ে থাকে—সেই রকম ছুটতেও পারে প্রচণ্ড জোরে, গতিতে তখন হরিণকেও হার মানায়।

দ্বিতীয় সমস্যা টিকটিকিরা আসে কোথা থেকে? একথা কেউ ভেবে দেখেছেন? প্রত্যেকেরই বাড়িতে টিকটিকি আছে, টিকটিকি ছাড়া বাড়ি হয়না। কিন্তু একটা নতুন বাড়িতে কী করে আসে প্রথম টিকটিকিটা? পাশের বাড়ি থেকে?

কিন্তু মাঠের মধ্যে একটা নতুন বাড়ি হল, কয়েকদিন পরেই সেখানে টিকটিকি দেখতে পাওয়া যাবে। আশেপাশে কোন বাড়ি নেই—তবু টিকটিকি আছে। ছারপোকা বা আরশোলার মতন তো ওরা মানুষের জামাকাপড় বা বাক্সে ভরে আসেনা, তবে কী করে আসে? এসপ্লানেডে যখন নতুন ল্যাট্রিন তৈরি হল, কয়েকদিন পরই সেখানে আমি টিকটিকি দেখেছি। বিস্ময়ে আমি কূলকিনারা পাইনি, আশেপাশের দুরন্ত গাড়িঘোড়ার রাস্তাঘাট পেরিয়ে টিকটিকিরা কি নিজে-নিজেই এসেছে এখানে? কতদূর থেকে ওরা দেখতে পায়? দূরের কোন বাড়ি বা হোটেল থেকে—একদিন নতুন বাড়ি ওঠার খবর পেয়ে, একটা টিকটিকি—না, একটা হলে বংশবৃদ্ধি হয়না, সুতরাং দুটো টিকটিকি একদিন যাত্রা করল। পথ দিয়ে বুকে হেঁটে-হেঁটে এগিয়ে, —ওখানকার রাস্তা দিয়ে সবসময় গাড়ি যাচ্ছে, সুতরাং অপেক্ষা করে-করে ট্রাফিক লাইট দেখে—লোকের জুতো বাঁচিয়ে একজোড়া টিকটিকি এসে পৌঁছয় নতুন বাড়িতে? ভাবতেও আমার ভয় হয়!

যাইহোক, আমি আমার নিজের ঘরের টিকটিকিগুলোকে নিয়েই বিষম বিব্রত। ওরা আমার ঘুম কেড়ে নিচ্ছে।

আমার ঘরে টিকটিকি আছে ছটা, অর্থাৎ স্থায়ী বাসিন্দা ছটি। এছাড়া দু-একটা আগন্তুক আসে মাঝে-মাঝে—এবং বিতাড়িত হয়ে যায়। রান্নাঘরের বা বাথরুমের টিকটিকি হয় কালচে রঙের বা ডোরাকাটা, শোবার ঘরের টিকটিকিরা ফর্সা, ছিমছাম সুতরাং অন্য টিকটিকি এলে আমি নিজেও চিনতে পারি। আমার ঘরের টিকটিকিগুলোকে আমি আলাদা করে চিনি—একথা বললে হয়তো অবিশ্বাস্য শোনাবে। চার্লি চ্যাপলিন মশা ও মাছিদের আলাদা করে চিনতে পারেন, ওঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, 'দিস ইজ নট ফিলিস,' কে না জানেন! আমার সে-ক্ষমতা নেই যদিও কিন্তু আমার টিকটিকিগুলোকে রোজ দেখতে-দেখতে এখন আমি ওদের সত্যিই চিনে গেছি। ওদের আলাদা নামও দিয়েছি। এই ছটার মধ্যে পাঁচটা প্রায় একই সাইজের আর-একটা বিশাল বড়। সেটার সাইজ গিরগিটির মতো —কিন্তু দেখলে কুমির ছাড়া আর কিছুই মনে পড়েনা—সারা গায়ে এবং ল্যাজে খাঁজ কাটা, বিকট ড্যাবডেবে চোখ মেলে যখন তাকায়, তখন আমারও বুক শিউরে ওঠে। কিন্তু যতদূর জানি, টিকটিকি কখনও মানুষকে কামড়ায়নি, ঘুমের ঘোরেও না! সুতরাং ভয় কাটিয়ে উঠি। কিন্তু প্রায়ই মনে হয় ওটা যখন আমার দিকে চেয়ে থাকে, তখন বোধহয় মনে-মনে ভাবে—ইস, আমার হাঁটা যদি আর-একটু বড় হতো তখন ঐ শুয়ে-থাকা নিরীহ, নরম চেহারার লোকটাকে কপ করে একেবারে গিলে ফেলতে পারতাম! —আমি ঐ বড়টার নাম দিয়েছি মাফিয়া। মাফিয়ার তাক অব্যর্থ। কখনও শিকার ফসকায়না, যতবড় পোকাই হোক—খপ করে এসে ধরবে।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা বাগান আছে। সেইজন্য অনেক পোকা ও পতঙ্গ আসে ঘরের মধ্যে। সবগুলিই নিরীহ পোকা—কী সুন্দর রং-বেরং প্রজাপতি ও মথ বা ফড়িং। সেগুলো নিয়ন আলোর রডের পাশে এসে বসে। আর টিকটিকির শিকার হয়। পাঁচটা সমান সাইজের টিকটিকি—আমি ওদের নাম দিয়েছি, কোনরকম যুক্তি না-ভেবে সজারু, মুসোলিনি, কিলফিল আর খাইবার। পঞ্চমটার নাম আর মনেই পড়েনা, তখন ওর নাম দিলাম তিন নম্বর। কেন এক নম্বর বা পাঁচ নম্বর নয়, তা ঠিক বলতে পারবনা —তিননম্বরই মনে পড়ল। ঐ তিননম্বরটাই পাঁচজনের মধ্যে সবচেয়ে দুরন্ত ও দুঃসাহসী। অন্যগুলো যখন দূরে একটা পোকা দেখে হিশেব করে, আস্তে-আস্তে এগোয়—তিননম্বরটা তখন সোজা ছুটে আসে, খপ করে চেপে ধরে। এই স্বভাবের জন্য, ও অনেক পোকা ধরতে পারে না, উড়িয়ে দেয়, আবার যখন ধরে, খুব তাড়াতাড়ি, অন্যগুলোর মতো একঘণ্টায় একটা নয়।

কিন্তু এইসব দেখতে-দেখতে আমার চোখ খারাপ হবার উপক্রম। রাত্রিবেলা শোবার পর যেই একবার চোখ পড়ে আলোর দিকে, আর চোখ সরতে চায়না, সেখানে তখন একটা ছোট্ট ফড়িংকে তাক করে আছে মুসোলিনি,—সুতরাং শেষ পর্যন্ত ধরতে পারে কিনা না-দেখে চোখ ফেরাতে পারিনা, তখন টিকটিকির ধৈর্যের সঙ্গে আমাকে পাল্লা দিতে হয়—ফড়িংটার ঠিক এক বিঘৎ দূরে মড়ার মতো পড়ে আছে টিকটিকিটা—কী যে ওর মতলব, কেনই বা ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ছেনা—কিছুই বোঝার উপায় নেই। সেই অবসরে আমি একটু চোখ ঘোরাতেই দেখি মাফিয়া হিংস্রভাবে গুটি-গুটি এগুচ্ছে একটা সবুজ মথের দিকে। সুতরাং আর চোখ ফেরানো যায়না। এইভাবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। আর ওরা সবগুলোই নিয়ন আলোর কাছাকাছি থাকে বলে—আমাকে ঐ উজ্জ্বল আলোর দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়, সুতরাং বুঝতে পারছি নিজের চোখের ক্ষতি করছি। টিকটিকির চোখের কিন্তু অত চড়া আলোতেও কিছুই ক্ষতি হয়না।

ক্রমশ আমার এটা নেশার মতো হয়ে যায়। রাতের পর রাত আমি টিকটিকির পোকা ধরা দেখি। শুনেছি ডারউইন সাহেব ২৪ ঘণ্টা একটা ফুলের কলির দিকে তাকিয়ে ছিলেন —একটা ফুল আস্তে-আস্তে কীভাবে ফোটে দেখার জন্য। টিকটিকির শিকার ধরার দৃশ্যের মধ্যে কোন সৌন্দর্য নেই, একটা নিষ্ঠুর পাশবিকতা শুধু, তবু তাই দেখতে আমার নেশা ধরে যায়। টিকটিকিদের স্বভাব সম্পর্কে আমি অনেককিছু আবিষ্কার করে ফেলি। তার মধ্যে প্রধান হল, কোন টিকটিকি—অন্য টিকটিকিকে সহ্য করতে পারেনা। কাছাকাছি এলেই একজন আরেকজনকে তাড়া করে যায়। আমরা ছেলেবেলায় দেখতাম, টিকটিকি ধরতে গেলেই টিকটিকির

ল্যাজ খসে যেত, ল্যাজটা ফেলে আসল টিকটিকিটা পালাত। আর সেই কাটা ল্যাজটাও জীবন্তের মতো নড়াচড়া করত। কিন্তু এখন দেখছি একটা টিকটিকি আর-একটার ল্যাজ সুযোগ পেলেই কামড়ে ধরে। তখন কিন্তু সেটার ল্যাজ খসে যায়না। তখন মুখ ফিরিয়ে অন্যটাকে কামড়ে ধরার চেষ্টা করে। একটা পোকার কাছাকাছি গিয়েও যে একটা টিকটিকি অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকে —সেটা কিন্তু শুধু উদাসীনতা বা প্রতীক্ষা নয়। আসলে তখন সে একচোখে দেখে পোকাটাকে, আর-এক চোখে দেখে দূরের আরেকটা টিকটিকিকে—একইসঙ্গে খাদ্য আহরণ ও আত্মরক্ষা—দুটোই চলতে থাকে। আরও বহু রহস্যময় স্বভাব আছে। একটা হয়তো আরেকটাকে তাড়া করে গেল, খানিকটা দূরে গিয়ে হঠাৎ কেন সে যে ভয় পেয়ে ঘুলঘুলির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে কে জানে? কোনটা হয়তো তাড়া করে যায় ঘরের শেষ পর্যন্ত, কোনটা হয়তো একটু দূর দিয়েই হঠাৎ থেমে গিয়ে আবার একঘণ্টা চুপচাপ। কার যে গায়ের জোর বেশি—তারও বোঝার উপায় নেই—এই একবার সজারু তাড়া করছে কিলফিলকে—সে ভয়ে পালাচ্ছে, আবার একটু পরেই কিলফিল তাড়া করছে সজারুকে—তখন ওর কী ভয়! তাড়া করার সময় ডাক হয় অন্যরকম, খিস-খিস খিস-খিস। আবার কেনই যে হঠাৎ একা-একা বুক ফুলিয়ে টিক-টিক-টিকটিক করে—তারও কোন মানে পাওয়া যায়না।

সবচেয়ে বিরক্তিকর লাগে, যখন কোন পোকা থাকেনা। অথচ ওদের পোকা ধরা দেখতে-দেখতে আমার নেশা লেগে গেছে। ঘুম আসছে না। তখন ইচ্ছে করে কোন জায়গা থেকে পোকা ধরে এনে ওদের সামনে ফেলে দিই। একদিন আমি এরকম করেছিলাম।

আমার বালিশের পাশে এসে বসল একটা মথ। বেশ বড়। দেখেই মনে হল আহা বড় সরল এই মথ বেচারা, জীবন সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই। আমার মাথার এত পাশে এসে বসেছে, কোন ভয়-ডর নেই, ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলেই তো ওটা চাপা পড়ে মরবে। বেগুনে রঙের নরম তুলোটি চেহারা, বোধহয় রাত্রে দেখতে পায় না—কেননা আমি এত কাছ থেকে ওকে দেখছিলাম, কোন ভয় পায়নি। তখন আমার মনে হল —এটা টিকটিকির সামনে পড়লে কী হয় দেখা যাক-না। ওদের সাধ্য নেই, এতবড় মথটাকে মারতে পারবে। একমাত্র মাফিয়ার কথা বলা যায়না, কিন্তু দেখলাম সেটা দেয়ালে নেই, বোধহয় ঘুলঘুলিতে বিশ্রাম নিচ্ছে। আমি মথটাকে আঙুল দিয়ে ঠেলে উঠিয়ে দিলাম। সেটা গিয়ে বসল উল্টোদিকের দেয়ালে। তখন আমি বিছানা থেকে উঠে আবার ওটাকে তাড়া দিলাম। তখন ওটা অন্ধের মতো কয়েক পাক ঘুরে এসে বসল আলোর কাছে! এমন ট্যালা, বসল প্রায় একটা টিকটিকির ঘাড়ের ওপর! সেটা তাড়াতাড়ি অমনি

ভয়ে সরে গেল!

তখন মথটা বিশাল ডানা মেলে ওখানে বসে—আর পাঁচদিকে পাঁচটা রকেটের মতো পাঁচটা টিকটিকি। কারুর সাধ্য নেই ওটার সামনে এগোয় অথচ তাকিয়ে আছে লোভীর মতো। আমার মজা লাগতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দেখি সেই দুর্দান্ত তিন নম্বরটা এগিয়ে এল। দাঁড়াল একেবারে মথটার মুখোমুখি। মথটা তবুও ওড়েনা। তিন নম্বরটা খ্যাক করে কামড়ে ধরল মথটার মাথা। আরম্ভ হল ডানা ঝটাপটি। আমি অবাক হয়ে দেখছি। তারপর দেখলাম আস্তে-আস্তে ফুলের পাপড়ির মতো মথটার দুটো বেগুনি ডানা খসিয়ে দিয়ে গিলছে তিননম্বর। অবিলম্বে শেষ হয়ে গেল।

সেইসময় বিষম অনুতাপ হল আমার। ছি, ছি, আমিই তো মথটার হত্যাকারী। একটু আগে উড়ে বেড়াচ্ছিল, টিকটিকিগুলোর ওপর জিঘাংসা জেগে উঠল আমার। কুৎসিত জীবগুলো কোন কাজে লাগেনা—মশা-মাছি-আরশোলা খায়না —শুধু সুন্দর সুন্দর মথ-প্রজাপতি ধ্বংস করে। এগুলো থেকে লাভ কী! আমি একটা ফুলঝাড়ু নিয়ে দেয়ালে-দেয়ালে টিকটিকিগুলো পেটাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা বিষম চালাক। আমার নাগাল থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে দেখে—আমি অনবরত ঝাঁটা চালিয়ে একটাকেও মারতে না-পেরে নিবৃত্ত হলাম শেষ পর্যন্ত।

হঠাৎ দেখি, আমাব পায়ের কাছে একটা টিকটিকি। আরে, এ যে দেখি তিননম্বর। কী, আমাকেও কামড়াতে এসেছে নাকি? দেখি, নড়ে-চড়েনা। ঝাঁটা দিয়ে খোঁচা দিলাম, তবু নড়েনা। মরে গেছে! কোনবার হয়তো ওর গায়ে ফুলঝাড়ুর ঘা লেগেছিল। এত সহজে ওরা মরে যায়? কখন লেগেছে বুঝতেও পারিনি। যাক ভালোই হয়েছে, আসল আসামী মরেছে। আমি ওটার ওপর এক ঘা ঝাঁটা কষিয়ে ঠেলে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকাল বেলা ওসব ভুলে গেছি। চা খেতে-খেতে কাগজ পড়ায় ডুবে গেছি। হঠাৎ মেঝেতে একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। অসংখ্য পিঁপড়ে একটা টিকটিকির মৃতদেহ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল আগের রাত্রের কথা। এই সেই তিননম্বর সেই দুর্দান্ত তিননম্বর, বিদ্যুতের মতো যার গতি, অতবড় মথটাকেও আক্রমণ করতে ভয় পায়নি—আজ সামান্য পিঁপড়েরা ওকে চিৎ করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কাল মথটার জন্য আমার দুঃখ হয়েছিল, আজ তিননম্বরের জন্যও আমার দুঃখ হল। খুবই দুঃখ, আমার প্রায় চোখে জল এসে গেল। কিন্তু সকালবেলা আমি একটা টিকটিকির দুঃখে কাঁদছি—মা এটা দেখতে পেলে আমাকে পাগল মনে করবেন ভেবে—আমি তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নিলাম। ওটাকে আমার মারা উচিত

হয়নি। জীবজগতের ব্যাপার, আহার্যের জন্য একজন আর-একজনকে মারবে। কিন্তু আমি এতবড় প্রাণী হয়ে ঐটুকু প্রাণীকে কেন মারতে গেলাম! দেয়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি, অন্য টিকটিকিগুলো দেয়ালের নানা কোণে লুকিয়ে থেকে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে। যেন বলছে, কেন, কেন, কেন তুমি ওকে মারলে? কেন?

১২

সেইদিন আমি প্রথম অনুভব করেছিলাম, বাংলা সাহিত্যে সতীদাহের পরের অধ্যায় প্রায় কিছুই লেখা হয়নি।

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে এক বুড়ি ভিক্ষের জন্য অনেকক্ষণ ধরে আমার কাছে পেড়াপিড়ি করছিল। আমি তাকে বারবার প্রত্যাখ্যান করতে-করতে রূঢ় হয়ে উঠছিলাম। কোথায় সিগারেট টানতে-টানতে গঙ্গার প্রথাগত সৌন্দর্য দেখব, তা নয় চোখের সামনে এক গলিত চেহারার বুড়ি। তাছাড়া ক্রমশ বিরক্ত ও রূঢ় হয়ে উঠছিলাম, অন্য একটি কারণে। আমার পকেটে কোন ছোট খুচরো ছিলনা, ছিল সিকি-আধুলি। ভিখিরি-টিখিরিদের মাঝে-মাঝে দু-চারটে পয়সা দিতে না-পারার মতো কৃপণ আমি নই, আবার টপ করে একটা সিকি দিয়ে দেবার মতো উদারও হতে পারিনা। আসলে এই বুড়িকে কিছু দেবার জন্যই পকেটে হাত দিয়েছিলাম, তারপর সিকির কম কিছু না-পেয়ে, আবার ওকে না-দেওয়া মনস্থ করেই ক্রমশ বিরক্ত হয়ে উঠছিলাম। কিন্তু বুড়িটার একঘেয়ে নাকেকান্না থামেনা, সুতরাং আমি স্থানত্যাগ করার উপক্রম করছি, তখন হঠাৎ সে আমার মুখের কাছে মুখ এনে বলল, 'কালু না? ও কালু, চেয়ে দ্যাখ, আমায় চিনতে পারিসনা?'

বলাই বাহুল্য, আমার নাম কালু নয় এবং ঐ অশীতিপর বৃদ্ধাকে চিনতে পারার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কিন্তু সে ততক্ষণে আমার হাত চেপে ধরেছে—ঠাণ্ডা, শিরা-ওঠা হাতের কেমন যেন হিলহিলে স্পর্শ। আমার শরীর শিউরে উঠলেও, আমি তৎক্ষণাৎ জোর করে হাত ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা না-করে সংযত-শান্ত গলায় বললাম, 'তোমার ভুল হচ্ছে বুড়ি, আমার নাম কালু নয়।'

—আমার ভুল হয়না। একেবারে কালুর মুখখানা বসানো। সেই ডাগর-ডাগর চোখ, কেষ্টপানা চুল—আমি কালুকে চিনিনা? তুই আমাকে চিনতে পারলিনা কালু?

—সত্যিই আমি কালু নই!

—বাড়ি কোথায়? ফরিদপুর না? মাইজপাড়ার দক্ষিণবাড়ির কালু না তুই?

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাকি কথাগুলো সব সত্যি। পূর্ববঙ্গে ওখানেই

আমাদের বাড়ি ছিল—সে কতদিন আগে, আঠেরো বছর আর দেখিনি। খেজুর গাছ থেকে রস চুরি করতে গিয়ে মাঝরাত্রে পুকুরের মধ্যে পড়ে গেছি আমি —মনে পড়ল সেই বাল্যকাল। কিন্তু সেখানে কালু কে ছিল? আমার ও-নামের কোন শৈশবসাথীর কথাও মনে পড়েনা। সব বৃদ্ধাকেই প্রায় একরকম দেখতে —তবু, এই বুড়ির কোঁকড়ানো মুখেব দিকে তন্নতন্ন কবে তাকিয়েও আমি একে কখনো দেখেছি, কিছুতেই মনে হলনা।

তারপর আব-একটা কথা মনে পড়তেই আমাব মাথাব মধ্যে ঝনঝন করতে লাগল। জীবনানন্দের কবিতায় যেমন হঠাৎ ভয়াবহভাবে জলে পড়ে যাবার কথা আছে, আমিও যেন এখানে দাঁড়িয়ে থেকেই অকস্মাৎ খেজুর গাছ থেকে পুকুরে পড়ে যাব।

কারণ, আমি বুঝতে পেরেছি, ইনি কার কথা বলছেন। আমার বাবার ডাক নাম ছিল কালু। আমার চোখ ডাগর-ডাগর তো দূরের কথা—বরং মেয়েরা বলে হাতির চোখের মতন—দেখা যায় কী যায় না—কিন্তু সে যাই হোক—আমার সঙ্গে আমার বাবার চেহারার কোন সাদৃশ্য আমি কখনও দেখিনি, স্মরণকাল থেকেই আমি তাঁকে দেখেছি চকচকে টাকমাথার এক ভারিক্কি চেহারার ভদ্রলোক। সুতরাং, আমার বাবার সঙ্গে যদি কোনকালে আমার চেহারার কোনরকম মিল থেকেই থাকে —সে নিশ্চয়ই অনেককাল আগের কথা, আমার জন্মেরও বহু আগে, অন্তত চল্লিশ বছর আগেকার কথা। আমার বাবার মৃত্যুই হয়েছে অনেকদিন।

আমি চকিতে কণ্ঠস্বরে সম্ভ্রম এনে বললাম, 'আপনি কি আমার বাবার কথা বলছেন? আমার বাবার ভালো নাম ছিল এই...।'

বৃদ্ধা এক গাল হেসে বললেন, 'তুই কালুর ছেলে? পেন্নাম কব, পেন্নাম কব—আমি তোর সম্পর্কে ঠাকুমা হই। দূর সম্পর্কের না, আমাব মরার খবর শুনলে তোদের তিনরাত্তির অশৌচ হবে। আমার কথা শুনিসনি তুই? আমি হলাম গে চিন্তামণি, লোকে বলত চিন্তে ঠাকরুন, তোর বাবার আপন কাকিমা হই। হা কপাল, আমি কালুর বিয়ের খবরই শুনিনি, আজ তার কতবড জোয়ানমদ্দ ছেলে। কেমন আছে রে কালু?'

—তিনি মারা গেছেন।

সেই ভিখারিণী, অর্থাৎ আমার ঠাকুমা খুব চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'সবাই মরে, শুধু চিন্তে বামনিই মরেনা।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি এখানে কতদিন আছেন?'

—কী জানি বাবা, সেসব কি আমার মনে আছে। সেই যে-বছর প্রথম যুদ্ধ বাধল—

কথাটা আমার পক্ষে হজম করা শক্ত। সে তো প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। জিজ্ঞেস করলাম, 'তারপর আর যাননি?'

—নাঃ! লোকে যেমন বেড়াল পার করে, তেমনি আমার ছোট দেওর ভবানী আমাকে কাশীতে পার করে দিয়ে গেল। তা বাবা বিশ্বনাথ আমাকে পায়ে ঠাঁই দিয়েছেন —ভবানীকে তুই চিনিস?

না, আমি চিনিনা। আমরা কুলীনের বংশ—আমার বাবার সময় থেকে সবাই মডার্ন হওয়া শুরু করেছে, কিন্তু আমার ঠাকুর্দারই ছিল মাত্র চারটি বউ। তাঁরও বাবা-কাকাদের ক'টা করে বউ ছিল—সেসব কথা ইতিহাসে আছে, আমি জানিনা। সারা বিশ্বে আমার কতজন অসাক্ষাৎ কাকা-জ্যাঠা ছড়িয়ে আছে, আমার পক্ষে জানা সম্ভবও নয়।

যাইহোক, আমার চিন্তামণি ঠাকুমার সঙ্গে আমি কাশীতে তাঁর বাড়িও গিয়েছিলাম। সেটাকে বাড়ি বলা যায়না, মণিকর্ণিকা ঘাটের পিছনদিকে একটা বাড়ির একতলায়—কাশীতে যেসব বাড়ির একতলা অব্যবহার্য—ঠাণ্ডা ও অন্ধকারে ষাঁড় ও কুকুরের রাত্রি-নিবাস, সেইখানে তিনি থাকেন। কী করে বা কী সাধে যে এতদিন বেঁচে আছেন—জানিনা। ওঁর মুখ থেকে সেকালের কিছু গল্প শুনলাম —সেইসঙ্গে ওঁর জীবনের ইতিহাস। আমি এখনও সেসব কথা বিস্তৃতভাবে লেখার যোগ্য হয়ে উঠিনি। আমার মন অস্থির, আমি 'আধুনিকতা' নামের এক দুঃস্বপ্নে ডুবে আছি। কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল। রামমোহন সতীদাহ বন্ধ করে খুবই মহৎ কাজ করেছিলেন নিশ্চিত। কিন্তু আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই দৃশ্য—পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে, বাংলাদেশের গ্রাম থেকে একটি যুবতী বিধবাকে—বিয়ে হয়েছিল মাত্র ছ'বছর আগে—স্বামী সন্দর্শন হয়েছে মাত্র চারদিন—সমস্ত আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে এনে —একা নির্বান্ধব অবস্থায় রেখে গিয়েছিল কাশীতে। বোধহয় উদ্দেশ্য ছিল এই, যুবতী বিধবা গ্রামে থেকে কখন কীভাবে বংশের নামে কালি দেয় কে জানে —তার চেয়ে দূর বিদেশে যা ইচ্ছে হোক। নির্বাসনে পাঠাবার আগে আমারই মামাতো-খুড়তুতো ঠাকুর্দারা এঁর গা থেকে শেষ টুকরো সোনার গয়না পর্যন্ত কেড়ে নিয়েছে। আমি একজন নবীন যুবা, ওল্টানো চুল, প্যাণ্টালুন ও টেরিলিনের শার্ট পরে, সিগারেট ফুঁকতে-ফুঁকতে গঙ্গার বিখ্যাত সৌন্দর্য দেখায় বিঘ্ন ঘটানোর জন্য যে-কুচ্ছিৎ চেহারার বুড়ি ভিখিরিকে প্রায় ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, তিনি আমারই রক্ত-সম্পর্কের ঠাকুমা।

তিনি কিন্তু কাশীতে আসার পর থেকেই ভিখারিণী হননি। আমারই কোন এক পিসতুতো ঠাকুর্দা না কী যেন, যাঁর নাম ছিল তারিণীশঙ্কর—তিনি ছিলেন

মহানুভব—প্রথম পনেরো বছর নিয়মিত প্রতিমাসে চিন্তামণি ঠাকুমাকে সাতটাকা করে মনি অর্ডারে পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যেক মাসে, কখনো ভুল হয়নি। তিনি মারা যাবার পর তাঁর ছেলে হরগোবিন্দও কয়েক মাস পাঠিয়েছিল। একবার চিন্তামণি ঠাকুমা এখানকারই একজন লোককে ধরে-করে হরগোবিন্দকে একটা চিঠি লেখান —তাতে লিখেছিলেন, বাবা হরগোবিন্দ, আজকাল তৈজসপত্রের দর আগুন, তুমি আমাকে এখন থেকে যদি দশটা টাকা পাঠাও, বড় ভালো হয়। অত না পারো, অন্তত ন'টা টাকা পাঠিয়ো। আমি চিরকাল তোমার ছেলেমেয়েদের আশীর্বাদ করব। এই চিঠি পেয়ে হরগোবিন্দর কী মতিভ্রম হয় কে জানে—সে হঠাৎ টাকা পাঠানোই বন্ধ করে দেয়! এরপর আরও তিনখানা চিঠি লিখেও উত্তর বা টাকা আসেনি। তখন চিন্তামণি ঠাকুরুনের বয়েস চল্লিশ পেরিয়ে গেছে—তখন আর অন্যপথে যাবারও উপায় নেই, সুতরাং ভিক্ষাবৃত্তি। 'হরগোবিন্দ কি বেঁচে আছে?' —তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

পৃথিবীর কোথায় কোন হরগোবিন্দ বেঁচে আছে কি মরে গেছে—তার আমি কী জানি! আমি চুপ করে রইলাম। নিজের কথা শেষ হবার পর তিনি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে অন্যদের কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। আমাদের কুলীন বংশের নানা শাখা-প্রশাখা ধরে এর-ওর কথা। আমি যে-কজন সম্পর্কে জানি বলতে লাগলাম। অর্ধ শতাব্দী আগে যে জায়গা ছেড়ে চলে এসেছেন, পাকিস্তান হয়ে যেসব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে সে-খবরও রাখেননা—যেসব আত্মীয়স্বজন ওঁকে চরম অবহেলা করেছে,—তাদের সম্পর্কে ওঁর কতখানি ব্যগ্রতা! ঠাকুমার দেওয়া বাতাসা ও কলার টুকরো খেতে-খেতে হঠাৎ আমার এক জ্যাঠতুতো দাদার কথা মনে পড়ল। তিনি কিছুদিন আগে এক শুদ্দুরের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছেন। সে-খবর শুনে ওঁর কী অবস্থা হয় আমার দেখতে ইচ্ছে হল। আমি জানিয়ে দিলাম।

ভেবেছিলাম, উনি আঁৎকে উঠবেন। অথবা কাঁদবেন। আমাদের অত বড় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে সে-ছেলেটা কালি লেপে দিয়েছে শুনে ওঁর দীর্ঘ জীবনের নির্যাতিত সতীত্বেও যেন কালি পড়বে। উনি তাকে শাপ-শাপান্ত করবেন।

কিন্তু সেই বলি-জর্জর বৃদ্ধা মুখের চামড়া আরও কুঁচকে একটা ছোট দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'আহা ছেলেমানুষ, না-বুঝে কী না কী করেছে। আমি কাল বিশ্বনাথের মন্দিরে ওর নামে পুজো দেব—যাতে ছেলেটা জীবনে সুখ পায়!'

১৩

বাস থেকে নেমে, সিগারেট কেনার জন্য পকেটে হাত দিয়েছি, অমনি বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। পকেট একেবারে ফাঁকা।

না, পকেটমার নয়। কিছুটা দোষ আমারই। বাসে ওঠার সময় খুচরো পয়সা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, পকেটে ছিল শুধু একখানা দশ টাকার নোট। ট্রামে-বাসে সাধারণত দশটাকার নোট ভাঙিয়ে দিতে চায়না। তাই বিনীতভাবে কন্ডাক্টারকে বলেছিলাম, খুচরো পয়সা নেই, এই দশ টাকার নোটটা যদি—। কন্ডাক্টর বিনা বাক্যব্যয়ে নোটটা নিয়ে আঙুলের ফাঁকে গুঁজে বলেছিলেন, টিকিটটা রাখুন চেঞ্জ পরে দেব।...

তৎক্ষণাৎ আমি মনে-মনে দুবার বলেছিলাম—ভুললে চলবেনা, কন্ডাক্টারের কাছ থেকে টাকা ফেরত নিতে হবে। ভুললে চলবে না...। আমার কীরকম সন্দেহ হয়েছিল, কন্ডাক্টর আমার চেয়েও ভুলো মন। সুতরাং মিনিট পাঁচেক বাদেই আমি বললাম, এই যে দাদা আমার টাকাটা। কন্ডাক্টর বরাভয় দিয়ে বললেন, 'দিচ্ছি দিচ্ছি, ব্যস্ত হচ্ছেন কেন, আপনি এসপ্লানেড অবধি যাবেন তো!' এরপর আর চাওয়া যায়না।

তাও আমি ভুলতামনা, যদি বসার জায়গা না-পেতাম। ভিড়ের বাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া আর জানালার পাশে বসে যাওয়ার মধ্যে অনেক তফাত। জানালার পাশে বসে আমি তুচ্ছ টাকাপয়সার কথা একেবারে ভুলে গেলাম, দেখতে লাগলাম কল্লোলিনী কলকাতাকে। নরম রোদের বেলা তিনটের দুপুর—এসময় লম্বা মিছিল, স্কুলের মেয়েদের বাস, ট্রাফিক পুলিশের হাত—সবকিছুই দেখতে ভালো লাগে। অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম, নিজের স্টপ পেরিয়ে যেতেই হুড়ুস-ধাড়ুস করে কন্ডাক্টরের পাশ দিয়েই ঝুপ করে নেমে পড়লাম।

টাকার কথাটা তক্ষুনি মনে পড়ত না হয়তো, কিন্তু সিগারেটের তেষ্টা পেয়েছিল বলেই দোকানের সামনে পকেটে হাত দিয়ে চৈতন্য হল। তখনও বাসটা চোখের আড়ালে যায়নি, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম রোককে, রোককে!

কেউ শুনতে পেলনা। বাসটা আস্তে-আস্তে চলছে, সামনের ট্রাফিকের আলোয় যদি থামে, আমি ছুটে আবার ধরে ফেলতে পারি। ছুটে বাস থেকে যখন কয়েক গজ দূরে পৌঁছেছি, সেই সময়ই সবুজ আলো জ্বলল, বাসটা হুস করে বেরিয়ে গেল। ইস, এইটুকুর জন্য টাকাটা ফসকে যাবে! পরের স্টপে বাসটাকে ধরা যায়না! পরের স্টপ বেশি দূর নয়, ইন্ডিয়ান এয়ার লাইনসের অফিসের সামনে। অনেক সময় মেয়েরা যদি ওঠে কিংবা নামে, তাহলে এক-একটা স্টপে বাস

অনেকক্ষণ দাঁড়ায়। কিন্তু আমাকে ঠকাবার জন্যই, ঐ স্টপ থেকে কেউ উঠল-নামলনা, আমি পৌঁছুবার ঢের আগে বাস ছেড়ে দিল।

তখনও বাসটাকে দেখতে পাচ্ছি, ঐ বাসে আমার টাকা। আমার গোঁ চেপে গেল। যে-করেই হোক বাসটাকে ধরতেই হবে। প্রথমেই মনে পড়ল ট্যাক্সির কথা। দরকারের সময় খালি ট্যাক্সি পাওয়া কীরকম অসম্ভব, তা সবাই জানে। দু-তিনটে ট্যাক্সিকে হাত তুলে থামাবার চেষ্টা করলাম, তারা অগ্রাহ্য করে চলে গেল। একটি ট্যাক্সিওয়ালা মুখের কাছে হাত দিয়ে বোঝাল, সে এখন খেতে যাচ্ছে, থামবেনা।

তারপর আমার মনে পড়ল, আমি ট্যাক্সি থামাবার চেষ্টা করছি কোন সাহসে? আমার কাছে তো আর টাকা নেই। বাস থেকে টাকা নিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া মেটাব —সেটা একটা গোলমেলে ব্যাপার; যদি কিছু এদিক-ওদিক হয়ে যায়! তাহলে আর-এক কেলেঙ্কারি হবে।

কিন্তু তখন আমি দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য, খালি মনে হচ্ছে, একটুর জন্য বাসটা চলে যাচ্ছে, ওটাকে ধরতে পারলেই টাকাগুলো ফিরে পাব—শুধু টাকার জন্য নয়, কন্ডাক্টরটি যদি আমাকে ঠকাবার কথা ভেবে থাকেন, তাহলে তাঁর একটু শিক্ষা পাওয়া দরকার!

পুলিশের হাতের সামনে বহু গাড়ি থেমে আছে, আমি তার মধ্যে গিয়ে এক-একজনকে অনুনয় করতে লাগলাম, 'আপনি কি সেন্ট্রাল এভিনিউ ধরে যাবেন? আমাকে একটা লিফট দেবেন?' সুবেশ, ভদ্র, গম্ভীর অধিকাংশ যাত্রী আমার কথায় কোন উত্তরই দিলনা, দু-একজন হাত নেড়ে কী যেন বলল। সাত-আটজনকে চেষ্টা করার পর যখন প্রায় নিরাশ হয়ে হাল ছেড়ে দেব ভাবছি তখন একটি ট্যাক্সির যাত্রী আমাকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ুন!'

ভদ্রলোকটি প্রৌঢ়, পোশাক দেখলে উকিল বা ব্যারিস্টার মনে হয়। প্রৌঢ় বলেই হয়তো তিনি মানুষের উপকার করা কিংবা বিপদে সাহায্য করার মতন পুরোনো ব্যাপারে এখনো বিশ্বাসী। সস্নেহে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে কী? বাড়িতে কোন বিপদ-টিপদ? আপনার মুখ দেখে মনে হল—'

আমি বললাম, 'না, ঐ বাসে...আমার টাকা...একটু তাড়াতাড়ি গিয়ে যদি ধরতে পারি...'

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, 'কী?'

আমি ব্যাপারটা আবার খুলে বললাম। তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমি সেদিকে লক্ষ না-করে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললাম, 'থোড়া জলদি চলিয়ে ওহি বাসঠো পাকড়না—!'

পাঞ্জাবি ট্যাক্সি-ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে কর্কশভাবে ভাঙা হিন্দিতে যা বলল,

তার মানে এই দাঁড়ায় : তোমার দরকার তো আমি তাড়াতাড়ি চালাব কেন? তোমার জন্য আমি অ্যাকসিডেন্ট করব? অতই যদি গরজ, নিজে ট্যাক্সি ভাড়া করলে না কেন?

—ট্যাক্সি খুঁজে পাইনি।

—এই দুপুরবেলা বিশ-পঞ্চাশখানা ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

হঠাৎ আমার শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। এ আমি কী ভুল করেছি। কলকাতায় ট্রাফিকের আলোর সামনে গাড়ি থামলে কত রাজ্যের ভিখিরি, চাঁদা আদায়কারী, ঠক জোচ্চোররা এসে ভিড় করে, এরা কি আমাকেও তাদের একজন ভেবেছে? কত প্রতারক বানিয়ে-বানিয়ে কত গল্প বলে, আমার ঘটনাও তাই সন্দেহ করেছে? নেহাৎ ক'টা টাকার জন্য একী পাগলামি আমার! আসলে টাকার জন্যও নয়, টাকা তো মানুষের হারিয়েও যায়, কিন্তু আমার ঝোঁক চেপে গিয়েছিল বলেই...!

প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমার দিকে আগাগোড়া চেয়ে দেখলেন। আমার পোশাক বা চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্য নেই। অনেক প্রতারকের চেহারা আমার চেয়ে ঢের চিত্তাকর্ষক হয়।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'এদিকে কোথায় এসেছিলেন?'

—অফিসে যাচ্ছিলাম।

—এই দুপুরবেলা অফিস?

—হ্যাঁ, আমাদের এরকমই, শিফট ডিউটি থাকে—

—কোন অফিস?

নাম বললাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু কী ভেবে বললেন, 'ও আচ্ছা আপনাদের অফিসেই তো ভবতোষ কাজ করে, চেনেন তাকে?'

—ভবতোষ কী? কোন সেকশান?

উনি যে-নাম বললেন, সে-নামের কারুকে আমি চিনিনা। বলে দিতে পারতাম, হ্যাঁ চিনি, কিন্তু তারপর যদি আবার জিজ্ঞেস করেন, কীরকম দেখতে বলুন তো। বুঝতেই পারলাম, উনি আমাকে উকিলি জেরা করে যাচাই করে নিতে চান। আমি যে জোচ্চোর নই, আমি যে আমিই এটা কী করে বোঝাব? একমাত্র উপায় যদি বাসটাকে তাড়াতাড়ি ধরা যায়। কিন্তু হয় ট্যাক্সিওয়ালা আস্তে চালাচ্ছে, কিংবা বাসটা জোরে ছুটছে, সেটা ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে।

আমি কাঁচুমাচু ভাবে বললাম, 'দেখুন, আমাদের অফিসে অনেক লোক, সবাইকে চেনা তো সম্ভব নয়। বিশেষ করে নতুন লোক।'

—ভবতোষ অনেকদিন চাকরি করছে।

—কিন্তু আমি নতুন ঢুকেছি।

—ও, তা তো হবেই, ইয়াং ম্যান। আচ্ছা, অমুক রায়চৌধুরীকে চেনেন, উনি তো টপ অফিসার।

এবার আমি সোৎসাহে বললাম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চিনি। (সত্যিই চিনি।) উনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। উনি এই মাস-ছয়েক হল রিটায়ার করেছেন।'

—রিটায়ার করেছেন? কই, আমার সঙ্গে গত সপ্তাহে দেখা হল, কিছু বললেন না তো।

কী মুশকিল তিনি যদি জনে-জনে ডেকে রিটায়ার করার কথা না শোনান, সেটা কি আমার দোষ। এদিকে, প্রায় বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত পৌঁছে গেছি, বাসটা এখনো আলেয়ার মতন খানিকটা দূরে। খুবই বোকামি হয়ে গেছে আমার, এরকমভাবে আসা। আমি বললাম, 'থাক, আর বেশি দূরে গিয়ে লাভ নেই। সামান্য কয়েকটা টাকা তো। অফিসেরও দেরি হয়ে যাচ্ছে, আমি বরং এখানেই নেমে পড়ি।'

ভদ্রলোক অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বললেন, 'না, না, এখানে নামবেন কেন? এতদূর এসেছেন যখন, চলুন! চলুন!'

সর্বনাশ, ভদ্রলোক কী ভাবছেন, বিবেকানন্দ রোড পর্যন্ত বিনা পয়সায় ট্যাক্সিতে আসাই আমার উদ্দেশ্য ছিল, তাই ঐ গল্পটা বানিয়ে বলেছি। কী ঝামেলায় যে পড়লাম। এত ট্রাফিক জ্যাম হয়, এখন একটা ট্র্যাফিক জ্যামে বাসটা আটকে যেতে পারেনা? ট্যাক্সিওয়ালা, তার সঙ্গী এবং এই প্রৌঢ় সহৃদয় লোকটির কাছে কী করে প্রমাণ করব, আমি একটা জোচ্চোর-বদমাস নই, আমার অন্য কোন মতলব নেই।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দারুণ অস্বস্তিকর নীরবতা। কী জানি, ওঁরা হয়তো ভাবছেন, আমি যে-কোন মুহূর্তে ছুরি-টুরি বার করতে পারি। আমি আগে ভেবেছিলাম এটা খুবই সামান্য ব্যাপার। ভদ্রলোক হয়তো মুহূর্তের দুর্বলতায় আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে এখন অনুতাপ করছেন।

হঠাৎ তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি তো গ্রে স্ট্রিট দিয়ে ডানদিকে বেঁকব, ওর মধ্যে যদি আপনার বাস না-ধরা যায়—'

টাকার চিন্তা আমার তখন চুলোয় গেছে। আমি তখন অবিশ্বাসী দৃষ্টি থেকে ছাড়া পেতে পারলে বাঁচি। বিগলিতভাবে বললাম, 'অত্যন্ত ধন্যবাদ আপনাকে, আমি গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে নেমে পড়ব, আর যাবনা—চেষ্টা করেও যখন পাওয়া গেলনা।'

—না, না, বাসের ডিপোতে চলে যান। সত্যিই যদি আপনার টাকা নিয়ে থাকে, তাহলে ছাড়বেন কেন।

সত্যিই যদি? কী সর্বনাশ! এ যে পুরোপুরি অবিশ্বাস! অবিশ্বাস হবেই-বা না কেন, সবারই তো ধারণা কলকাতার পথঘাট এখন ঠগ-বদমাসে ভরা।

ঠিক গ্রে স্ট্রিটের মোড়ে বাসটাকে ধরে ফেলল ট্যাক্সিটা। আমি ভদ্রলোককে দ্রুত ধন্যবাদ জানিয়ে পড়ি-মরি করে ছুটে চলন্ত বাসে উঠে পড়লাম। কন্ডাক্টর আমাকে দেখে অবাক, হয়তো বিশেষ দোষ নেই তাঁর তবু খুব চোটপাট করলাম ওঁর ওপরে। কন্ডাক্টর বিনা বাক্যব্যয়ে আমাকে টাকা গুণে দিলেন।

ততক্ষণে বাস আরও দুস্টপ এগিয়ে গেছে। টাকাগুলো নিয়ে নামতেই দেখি পিছনে সেই ট্যাক্সি, প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে। ওঁর না ডানদিকে বেঁকে যাবার কথা ছিল? আমাকে যাচাই করতে এসেছেন।

আমার ওপর বিরাট দায়িত্ব। অনেককিছু নির্ভর করছিল আমার ওপর। ঐ ভদ্রলোকের কাছে প্রমাণ করতে হবে যে, কলকাতার রাস্তায় সবাই প্রতারক-জোচ্চোর-বদমাইস নয়। এখনও লোকে সত্যিকারের বিপদে পড়ে সাহায্য চায়। বাড়িতে ফিরে ওঁকে 'খুব জোর বেঁচে গেছি' ধরনের একটা রোমহর্ষক গল্প বলতে হবেনা।

আমি সগর্বে টাকাগুলো প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখিয়ে বললাম, 'এই যে, পেয়েছি! পেয়েছি!'—তারপর ঐ ট্যাক্সিওয়ালাকেও শিক্ষা দেবার জন্য উল্টোদিকের আর-একটা ট্যাক্সি ডেকে উঠে বসলাম!

১৪

বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমরা দুজনেই হেসে লুটোপুটি। এক-একটা কথা আদ্ধেক উচ্চারণ করছি আর হাসির দমকে আমাদের শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠছে। রাস্তার লোক আমাদের দিকে তাকিয়ে অবাক। অমিতাভ বলল, 'জিনিয়াস! ওফ, জিনিয়াসই বটে, হা-হা, হো-হো-হি-হি!'

খানিকটা বাদে, একটু সামলে নিয়ে আমরা দুজনেই খুব দুঃখিত হয়ে পড়লাম। আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, 'বুঝলি অমিত, হেমন্তদার বাড়িতে আর আসা যাবেনা!'

অমিতাভ বলল, 'মাথা খারাপ। অন্তত পাঁচ-ছ বছর না-কাটলে আমি আর এ-বাড়ির ধারে কাছে আসছিনা!'

হেমন্তদা কানপুরে মাস আষ্টেক ছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এসেছেন শুনে আমি আর অমিতাভ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু কানপুরে গেলে

মানুষ এমন বদলে যায়?

হেমন্তদা আমাদের ছেলেবেলার হীরো। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে মিশে বখে গিয়ে আমি যখন অধঃপতনের দিকে বেশ দ্রুত গড়াতে শুরু করেছিলাম, হেমন্তদা সেই সময় আমাকে উদ্ধার করলেন। হেমন্তদা তখন অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি নিয়ে রিসার্চ করছেন, উন্নত দীপ্তিমান চেহারা, সুস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—ভিড়ের মধ্যে থাকলেও হেমন্তদার দিকে সহজেই চোখ পড়ে। হেমন্তদা তাঁর বাড়িতে একটা স্টাডি সার্কল করেছিলেন, সেখানে আমাদের ডেকে নিলেন। হেমন্তদার সান্নিধ্যে এসে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য—সবকিছুই হেমন্তদা কত ভালো জানেন, আর কী সরলভাবে আমাদের বুঝিয়ে বলতেন। শিশু ও কিশোরদের মনস্তত্ত্ব বিষয়ে হেমন্তদার নিজস্ব কতকগুলো ধারণা ছিল, সেই অনুযায়ী তিনি আমাদের বিনামূল্যে শিক্ষা দিতেন। সত্যি বলতে কী, আমি অন্তত যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলাম। হেমন্তদাই আমাদের শিখিয়েছিলেন, যুক্তি দিয়ে সবকিছু বিচার করবে। নিজের যুক্তি দিয়ে যা শেষ পর্যন্ত মানতে পারবে না তা আর কারুর কথাতেই মানবেনা—সে তোমার ঠাকুর্দাই বলুক, বা মাস্টারমশাই বলুক বা হেমন্তদাই বলুক!

দু-একবছর বাদে অবশ্য হেমন্তদার বাড়ির স্টাডি সার্কল বন্ধ হয়ে গেল, হেমন্তদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হলেন, কিন্তু আমরা কয়েকজন ওঁর অন্তরঙ্গ রয়ে গেলাম। হেমন্তদা বিয়ে করলেন, লতিকা বৌদিকেও আমাদের অসম্ভব ভালো লাগত। চেহারায় যেমন মানিয়েছে দুজনকে, তেমনি স্বভাবেও, লতিকা বৌদির ব্যবহার মধুর কিন্তু ন্যাকামি নেই। প্রায়ই সন্ধেবেলা আমরা হেমন্তদার বাড়িতে আড্ডা জমাতাম। লতিকা বৌদি কড়াইশুঁটি বেটে ডিমের সঙ্গে মিশিয়ে একরকম চপ বানাতেন, তার অপূর্ব স্বাদ ঘন-ঘন কফি কিংবা চা, এবং ততদিনে আমরা হেমন্তদার সামনে সিগারেট খেতে শুরু করেছি। অমিতাভ বেশ ভালো রসিকতা করতে পারে—পৃথিবীর যে-কোন বস্তুই তার রসিকতার উপলক্ষ হতে পারে—আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে অমিতাভর রসিকতা শুনে হেমন্তদা আর লতিকা বৌদির বিশুদ্ধ উচ্চহাস্যধ্বনি এখনো আমার কানে বাজে। লতিকা বৌদির যখন সন্তান হল, নার্সিংহোমে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম। কী সুন্দর ফুটফুটে ছেলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনা ছেড়ে হেমন্তদা মিলিটারি ইনটেলিজেন্স-এর বড় চাকরি নিলেন। সেই সূত্রেই ওঁকে কানপুরে গিয়ে আটমাস থাকতে হল। কলকাতা ছেড়ে যখন যান, তখন ওঁদের বাচ্চাটির বয়েস ন-মাস।

ফিরে আসার পর আমি আর অমিতাভ দেখা করতে গেলাম। কানপুরে হেমন্তদার বোধহয় তেমন বন্ধু জোটেনি, আড্ডা মারার সুযোগ ছিলনা, অফিসের সময় ছাড়া সারাক্ষণ বাড়িতেই কাটাতেন। তার ফলে কী সাংঘাতিক পরিবর্তন!

হেমন্তদার ছেলের বয়স এখন বছর দেড়েক, বেশ স্বাস্থ্যবান, কিন্তু ভয়ানক একরোখা। অমিতাভ একটু গালটিপে আদর করতে গেছে অমনি প্যাঁ করে শানাই-এর সুরে কেঁদে উঠল। হেমন্তদা তাড়াতাড়ি যেই কোলে তুলে নিলেন, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে চুপ। হেমন্তদা বাথরুমে ছিলেন একটু আগে, পাজামার দড়িটা ভালো করে আঁটেননি, সেই অবস্থায় ছেলেকে কাঁধে করে ঘুরতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'ছেলের কী নাম রাখলেন হেমন্তদা?' হেমন্তদা মুখ ফিরিয়ে জবাব দিলেন, 'নাম রেখেছি শ্রুতিধর। এমন আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি তোমায় কী বলব। যে-কোন কথা একবার শুনলেই মনে রাখে। দেখবে? বুলবুল, মুংকু, রিংকু, সোনা-সোনা, বলো তো সেই ছড়াটা? জ্যাক অ্যান্ড জিল ওয়েন্ট আপ দি হিল। বলো, বলো? বলো মিণ্টু সোনা—'

ছেলেটা গোলগোল চোখ করে কতক্ষণ তাকিয়ে রইল। আমরাও উদগ্রীব, দেড়বছরের ছেলে ইংরেজি ছড়া শোনাবে এ-এক পরমাশ্চর্য ব্যাপার। ছেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বিনা নোটিশে আবার শানাই-এর প্যাঁ ধরল। হেমন্তদা দমলেননা। 'থাক, থাক, আচ্ছা সেই বাংলাটা বলো, ওপারেতে লঙ্কাগাছ রাঙা টুকটুক করে—এইটা বলো, আজ সকালেও তো বললে, কাকু, কাকুরা এসেছেন, শোনাও, কই?'

ছেলে আবার প্যাঁ—আঁ—আঁ—আঁ—

আমার মনে হল ছেলে শ্রুতিধর হতে পারে, কিন্তু কান্নার ব্যাপারটাই তার স্মৃতিতে প্রধান হয়ে গেঁথে আছে। অমিতাভ বলল, 'থাক হেমন্তদা, ওর বোধহয় এখন মুড ভালো নেই।' হেমন্তদা বললেন, 'না না, এই তো একটু আগে হেসে-হেসে কত খেলা করছিল। আচ্ছা এই দ্যাখো।'

হেমন্তদা টাইপরাইটারের ঢাকনাটা খুললেন, ছেলেকে বললেন, 'শ্রুতিধর, বলো তো 'বি' কোনটা?' ছেলে এবার কোল থেকে ঝুঁকে খটাখট টাইপরাইটারের চার-পাঁচটা চাবি টিপল তার মধ্যে 'বি' অক্ষরটাও আছে। আমরা বিস্ময়ে হতবাক। হেমন্তদা উদ্ভাসিত মুখে বললেন, 'দেখলে? আশ্চর্য না? খোকন বলো তো বেড়ালের ছবি কোথায়?'

ছেলে দেয়ালের দিকে বেড়াল আঁকা ক্যালেন্ডারের দিকে আঙুল বাড়িয়ে উং গিং বুম বাম লাল্লাল—এই ধরনের কী-একটা বলল। আমরা বললাম, 'সত্যি, কী আশ্চর্য! ভাবাই যায়না!'

হেমন্তদা পরিতৃপ্তির হাসি হাসতে-হাসতে বললেন, 'ওর মামা একজন বিরাট ডাক্তার, তিনি তো বলেন,এ-ছেলের মধ্যে জিনিয়াসের চিহ্ন আছে। আমি অবশ্য কথাটা হেসে উড়িয়ে দি। কিন্তু ছেলেটা এমন সব আশ্চর্য-আশ্চর্য কাণ্ড করে,

এই বয়েসের ছেলের পক্ষে ভাবাই যায়না সত্যি! দেখবে আর-একটা?'

এরপর আমরা দেড়ঘণ্টা ছিলাম, অনবরত চলল এইসব, হেমন্তদা ছেলেকে এক-একটা অসম্ভব সব ব্যাপার করে দেখাতে বলছেন, এ-বি-সি-ডি বলা থেকে শুরু করে ভারতনাট্যমের মুদ্রা পর্যন্ত, আর ছেলে কখনো মুখ দিয়ে দুর্বোধ্য আওয়াজ বার করছে শুধু, কখনো কেঁদে উঠছে তারস্বরে, কখনো এটাসেটা ভাঙছে। কোমরের পায়জামার দড়ি আলগা করে বাঁধা, কাঁধে ছেলে—হেমন্তদাকে হাস্যকর দেখাচ্ছে। ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য—এসব প্রসঙ্গ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে, সর্বক্ষণ শুধু ছেলের কথা। যে-হেমন্তদা শিশু মনস্তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, যিনি আমাদের যুক্তিবাদী হতে শিখিয়েছিলেন, সেই হেমন্তদাই দেড় বছরের ছেলেকে নিয়ে এমন আদিখ্যেতা করছেন—যা দেখে যে-কোন লোকের হাসি পাবে। আমরা অতি কষ্টে হাসি চেপে বসে রইলাম।

লতিকা বৌদিরই অনেক বদল হয়েছে। আমাদের আর চপ-টপ কিছুই খাওয়ালেননা। চেহারা এবং কথাবার্তা সবই ভোঁতা হয়েছে একটু, উনিও হেমন্তদাকে তাল দিতে লাগলেন, ছেলেকে দিয়ে ছড়া বলাবার চেষ্টায় নাজেহাল হলেন ছেলের যখন কান্না ওঁর মুখখানাও তখন কাঁদো-কাঁদো।

বাইরে বেরিয়ে অমিতাভ আর আমি প্রাণ খুলে হেসে নিলাম। দুজনে ঠিক করলাম, ছেলেটা বেশ বড় না হওয়া পর্যন্ত আমরা আর হেমন্তদার বাড়িতে আসব না।

সত্যিই চার-পাঁচবছর আর যাইনি। কিন্তু এর মধ্যে অমিতাভর সঙ্গে আবার আমার ঝগড়া হয়ে গেল। প্রায় মুখ দেখাদেখিই বন্ধ। অর্পিতা ছিল আমার বান্ধবী, বেশ ব্যাপারটা জমে উঠেছিল, একসঙ্গে সিনেমা দেখা, লেকে বেড়ানো-টেড়ানো বেশ চলছিল—এই সময় অমিতাভর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েই নিজের সর্বনাশ ডেকে আনলাম। অমিতাভ চমৎকার রসিকতা করতে পারে, পোশাক পরে সবসময় আধুনিকতম, চলন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নেমে পড়া ওর স্বভাব। সুতরাং আমার যা নিয়তি —সবসময় প্রতিযোগিতায় হেরে যাওয়া, ব্যর্থ হওয়া—তাই হল, অমিতাভ ঝপ করে অর্পিতাকে বিয়ে করে ফেলল! ব্যাপারটাকে হাসিমুখে মেনে নেব—এতখানি স্পোর্টিং স্পিরিট সত্যিই আমার নেই। সেই অমিতাভ বিশেষ করে অর্পিতার ব্যবহারে আমি সত্যিই দুঃখ পেয়েছিলাম। দিনকতক সিরিয়াসলি দাড়ি রাখার কথাও ভেবেছি।

কিন্তু সব দুঃখই একসময় পুরোনো হয়ে ফিকে হয়ে যায়। হৃদয়ে সেইসব পুরোনো দিনের কথা আর ঢেউ তোলেনা। সুতরাং একটা মিউজিক কনফারেন্সে যখন আমার সঙ্গে অমিতাভ আর অর্পিতার চোখাচোখি হয়ে গেল, তখন আর

রক্তে ঝড় উঠল না। এবং ওরা দুজনে যখন এসে কথা বলতে এল, আমি মুখ ফেরাতে পারলামনা। এমনকী ওদের বাড়িতে যাবার নেমন্তন্নও গ্রহণ করে ফেললাম।

ফিটফাট সাজানো সংসার ওদের, স্বামী-স্ত্রী আর একটি আড়াই বছরের মেয়ে। বিয়ের আগে অমিতাভর ঘরটা কী অগোছালোই থাকত—এখন দেখলে চেনাই যায়না। আরও অনেককিছু চেনা যায়না। মেয়ের নাম রেখেছে পূর্বা, বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, ঠাণ্ডা, কাঁদেনা, মুখখানা অর্পিতার মতনই মিষ্টি। অমিতাভ আর আমি অনেক পুরোনো দিনের কথা ঝালিয়ে নিলাম। প্রায় চারবছর দেখা হয়নি।

কথার মাঝে-মাঝে মেয়েটি এসে বাধা দিচ্ছিল। বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কতরকম প্রশ্ন, কতরকম কৌতূহল—সেগুলোর জবাব না দিলে চলেনা—সুতরাং বারবার আমাদের কথা বাধা পাচ্ছিল। নিজের মেয়ের এসব প্রশ্নে বাবা হয়তো বিরক্ত হয়না—কিন্তু আমি আর কতক্ষণ সহ্য করব। বুঝতে পারলাম, ঐ মেয়েকে বাদ দিয়ে কোন কথা বলা যাবেনা। অর্পিতা কয়েকবার ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছিল—কিন্তু মেয়ে কিছুতেই যাবে না, বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারেনা। সুতরাং কথার কথা হিসেবে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কীরে অমিত, মেয়েকে কোন স্কুলে ভর্তি করবি?'

অমিতাভ বলল, 'এখুনি কী, মোটে তো আড়াই বছর বয়েস।'

—বাড়িতে কিছু শেখাচ্ছিস-টেখাচ্ছিস?

—অমিতাভ হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'না ভাই। ছড়া শেখানো কিংবা নাচ শেখানো—তারপর বাড়িতে লোকজন এলে জোর করে তাদের সেইসব শোনানো? এসব আমার ধাতে নেই।'

আমি বললাম, 'বেঁচেছিস।'

—দ্যাখ-দ্যাখ মেয়েটা কী করছে কাগজ-পেন্সিল নিয়ে। একটা ফাঁক পেলেই মেয়েটা আপন মনে ছবি আঁকে।

আমি হাই তুলে বললাম, 'তাই তো দেখছি।'

অমিতাভ বলল, 'আনন্দবাজারে যেসব 'আঁকা বাঁকা' বেরোয়, তার থেকে পূর্বা অনেক ভালো আঁকে। সম্পাদকের কাছে পাঠালে লুফে নেবেন।'

আমি উদাসীনভাবে বললাম, 'পাঠালেই পারিস।'

—তুই দেখবি ওর আঁকা কয়েকটা ছবি?

—না, আমি আর দেখে কী করব? আমি আর্ট ক্রিটিকও নই, ছবি ছাপার ব্যাপারেও আমার বিন্দুমাত্র হাত নেই।

—সেজন্য নয় এমনিই দ্যাখ-না—বিশ্বাসই করা যায়না, ঐটুকু মেয়ে...

অর্পিতা কাছেই দাঁড়িয়ে চা তৈরি করছিল, বলল, 'ওর এক মামা তো বড় আর্টিস্ট, তারই ছোঁয়া লেগেছে বোধহয় মেয়েটার।'

শুনেছিলাম বটে অমিতাভর এক মামা বোম্বেতে হিন্দি সিনেমার আর্ট ডিরেক্টার। তিনি হলেন গিয়ে বড় আর্টিস্ট। ঢোঁক গিলে আমি বললাম, 'বাচ্চাদের অনেকসময় আঁকিবুকি ছবি আঁকার ঝোঁক দেখা যায় বটে—কিন্তু বড় হলে আর ওসব কিছু থাকেনা।'

অমিতাভ অত্যন্ত বিরক্তির মুখ করে বলল, 'না রে, পূর্বার মধ্যে খুব অল্পবয়েস থেকেই ছবির দিকে একটা টান...মানে যখন ওর মাত্র ছ'মাস বয়েস—তখন ওর দিকে একটা পুতুল আর একটা লালরঙের পেনসিল বাড়িয়ে দিতে দেখা গেল —ও কিছুতেই পুতুলটা নেবেনা, লাল পেনসিলটাই নেবে!'

আমি স্তম্ভিতভাবে কিছুক্ষণ অমিতাভর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'বাচ্চাদের সঙ্গে ষাঁড়ের খুব মিল আছে জানিস? ওরাও লাল রং খুব ভালোবাসে। তোর মেয়ে লাল রং বলেই পেনসিলটা ধরতে গিয়েছিল, শুধু পেনসিল বলেই নয়।'

অর্পিতা বঙ্কিম হাস্যে বলল, 'আপনার কথাবার্তা ঠিক আগের মতোই আছে দেখছি।'—অর্পিতার এই মন্তব্যের ঠিক কী মানে তা বোঝা না-গেলেও এটুকু বুঝতে পারলাম, ও আমার কথাটা মোটেই পছন্দ করেনি। কেননা আমার চায়ে ও চিনি দিতে ভুলে গেছে এবং অতি ট্যালটেলে বিস্বাদ লিকার।

এরপর দেড়ঘণ্টা ধরে অমিতাভ আর অর্পিতা আমাকে ওদের মেয়ের শিল্প-প্রতিভা বোঝাবার চেষ্টা করল। দুটো লম্বা আর একটা গোল দাগ দেখিয়ে অর্পিতা বলল, 'দেখেছেন কী চমৎকার মানুষ এঁকেছে—অনেকটা ওর বড় মামার মতো। আর এই দেখুন এই একটা হরিণ। আর কী আশ্চর্য দেখুন, ও কখনো পাহাড় দেখেনি—অথচ কী সুন্দর পাহাড়ের ছবি এঁকেছে।' অমিতাভ বলল, 'পূর্বা জন্তু-জানোয়ার আঁকতে খুব ভালোবাসে—পূর্বা, কাকামণিকে একটা বাঁদর কিংবা হনুমান এঁকে দেখাও তো। এই নাও পেনসিল, নাও আঁকো।'—আমি বললাম, 'কী রে অমিত, ও বাঁদর আঁকার জন্য তোর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে কেন?'—এত রসিকতাজ্ঞান ছিল অমিতের, কিন্তু তখন হাসলনা গ্রাহ্যই করলনা, বলল, 'আঁকো মামণি, এঁকে দেখাও।'

টেকনিকটাই শুধু বদলেছে। ব্যাপারটা সেই একই আছে। দেড় ঘণ্টায় আমি ক্লান্ত বিরক্ত, গলদঘর্ম হয়ে উঠলাম। বাইরে বেরিয়ে মনে পড়ল, হেমন্তদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি আর অমিত কীরকম হেসেছিলাম। আজ অমিতের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আমি হাসতেও পারছিনা।

সেদিন আমার দুটি বিষয়ে উপলব্ধি হল। এক অর্পিতাকে বিয়ে না-করে আমি খুব জোর বেঁচে গেছি। আর দ্বিতীয়ত, বিয়ে করলেই যদি বাবা হতে হয়—এবং বাবা হলেই যদি হেমন্তদা কিংবা অমিতাভর মতন বোকা হয়ে যেতে হয়—তবে ইহজীবনে আমি সংসারধর্ম কিছুতেই গ্রহণ করছিনা।

১৫

রূপকথার বইয়ের ছবিতে ছাড়া ছেলেবেলায় আমি একজন মাত্র রাজকুমারী দেখেছিলাম। রাজকুমারী বলতে এখনো আমার চোখে সেই তারই মুখ ভেসে ওঠে।

শোভাবাজারে একটি বাড়িতে আমরা ছেলেবেলায় খেলতে যেতাম। বাড়ির ছাদে বাতাবী লেবু নিয়ে ফুটবল খেলা কিংবা গলিতে ক্যাম্বিস বল দিয়ে ক্রিকেট কিংবা দুপুরবেলা ক্যারাম খেলার স্তর পেরিয়ে তখন আমরা ক্লাব করতে শিখেছি। প্রত্যেক বিকেলবেলা ক্লাবের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা না-হলে এবং মাঝে-মাঝে ক্লাবের কার্য পরিচালনা সম্পর্কে মিটিং-এ না-বসতে পারলে তখন আর রাত্রে ঘুম আসতে চাইতনা। তখন আমরা ক্লাস সিক্স-সেভেনে পড়ি, টিফিনের পয়সা জমিয়ে ক্লাবের জন্য ব্যাডমিন্টনের জন্য নেট আর চারখানা র‍্যাকেট কিনে ফেলেছি, ছোটকাকা যেদিন আমাদের ক্লাবকে একটা তিননম্বরের নতুন ফুটবল কিনে দিলেন সেদিন আর আমাদের আনন্দের শেষ নেই, ছোটকাকাকে বললাম, 'বল যখন দিয়েছ, তখন একটা পাম্পারও কিনে দিতে হবে। নিজেদের পাম্পার না-থাকলে ফুটবল খেলায় কোন সুখই থাকেনা।'

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই, আমাদের পাড়াতে যে একটিমাত্র মাঠ, সেটা ছিল দাদাদের বয়েসীদের ক্লাবের দখলে। আমরা দুপুরের দিকে একটু-আধটু সেখানে খেলার সুযোগ পেলেও বিকেলের দিকে দাদারা এসে পড়ত হৈ-হৈ করে। গাঁট্টা মেরে আমাদের বিদায় করে দিত।

সুতরাং আমরা ঘুরতে-ঘুরতে শোভাবাজারের সেই বাড়িটা বার করেছিলাম। রাজা অমুকচন্দ্র সিংহের বাড়ি—সেকালের বিরাট প্রাসাদ, দরজার সামনে একজন অশ্বারোহীর পাথরের মূর্তি, দরজা পেরিয়ে প্রশস্ত ঢাকাবারান্দায় কীরকম যেন সোঁদা-সোঁদা গন্ধ, মাথার ওপর অগুন্তি ত্রিশিরা কাচ বসানো ঝাড়লণ্ঠন, একপাশে শ্বেতপাথরের ঠাকুর দালানে অস্পষ্ট অসংখ্য তেলরঙের ছবি, লোকে বলত সেটা সেজো রাজার বাড়ি। বড় রাজা কিংবা মেজো রাজার বাড়িতে কখনো আমার ঢোকার সৌভাগ্য হয়নি, কিন্তু সেই তেরো বছর বয়েসে—ঐ সেজো রাজার বাড়িই

আমার চোখে অফুরন্ত বিস্ময়ের ভাণ্ডার, যত রাজ্যের রূপকথা আর ইতিহাসের কাহিনীর সব রাজবাড়ি আমি ঐ বাড়িটির মধ্যে প্রত্যক্ষ করতাম, প্রত্যেক দিনই সেই বাড়িতে ঢুকতে আমার গা ছমছম করত।

সেই বাড়ির মধ্যে বিশাল উঠোন, একটা প্রমাণ সাইজের ফুটবল গ্রাউন্ডের প্রায়-সমান, সবুজ তকতকে ঘাসে ঢাকা। আমাদের দলের অবনী ছিল খুব তুখোড় ছেলে, সে নাকি স্বয়ং সেজো রাজার পিসতুতো শালার কাছ থেকে আমাদের খেলার অনুমতি নিয়ে এসেছিল। সেইসব দিনে আমরা কারুর স্ত্রীর ভাইকেও শালা বলে উচ্চারণ করতাম না, ঐ কথাটা ছিল খারাপ কথা, আমার মেজোমামা সম্পর্কে একজন পাড়ার লোক একদিন আমার মুখের ওপর 'তোর বাবার শালা' বলায় আমি একেবারে কুঁকড়ে গিয়েছিলাম। যাই হোক, সেই রাজবাড়িতে লোকজন ছিল খুবই কম, অবনীর কথা শুনে আমরা ভেতরে ঢুকেছিলাম, কেউ কোন আপত্তি করেনি। মাঝে-মাঝে শুধু একজন বাবরি চুলওয়ালা বুড়ো এসে আমাদের খেলা দেখত, আর আমাদের কারুকে ডেকে বলত, 'খোকা, বেশ তো তোমার মুখখানা, বেশ তো ছুটতে পার তুমি, যাও তো ছুটে মোড়ের পানের দোকানে বলে এসো তো একডজন সোডা দিয়ে যেতে!' তিনিই ছিলেন পিসতুতো শালাবাবু। আমার বাবাকে দেখেছি মাঝে-মাঝে হজমের গণ্ডগোল হলে একটা সোডা আনিয়ে খেতেন। ভাবতাম, ওরা তো রাজবাড়ির লোক—ওদের বোধহয় হজমের গণ্ডগোল সারতে একডজন সোডা লাগে।

সেই বাড়িতেই আমি আমার জীবনের প্রথম রাজকুমারীকে দেখি। উঠোনের দক্ষিণ দিকে একটা কারুকার্য-করা ঝুলবারান্দা ছিল—সেইখানে তিনি মাঝে-মাঝে পড়ন্ত বিকেলবেলা এসে দাঁড়াতেন। আরও অন্যদিকেও বারান্দা ছিল, কিন্তু তিনি শুধু ঐখানেই দাঁড়াতেন, ঐ দক্ষিণদিকে—যেখানে শেষসূর্যের বাঁকা রশ্মি পড়ে। রূপকথায় পড়েছিলাম—সেই এক মায়া রাজপুরী আছে—যার সব ঘরে যাওয়া যায়, কিন্তু দক্ষিণদিকে যাওয়া নিষেধ। আমি ঐ রাজকুমারীকে শুধু সেই দক্ষিণদিকেই দাঁড়ানো দেখে এক অদ্ভুত ভয়-মেশানো রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। পুরোনো শঙ্খের মতন গায়ের রং, একমাথা কোঁকড়া চুল, তাঁর বয়েস তখন সতেরো-আঠেরোর বেশি নয়, পৃথিবীর সব রূপকথার নায়িকার মুখে আমি ঐ রাজকুমারীর মুখ বসিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি শুধু বারান্দায় কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যেতেন।

প্রথমদিন তাকে দেখে আমি অবশ্য ভয়ই পেয়েছিলাম। খুব বেশি সুন্দর জিনিশ দেখলে প্রথমটায় আমার বরাবরই ভয় করে। তাছাড়া অন্য ভয়ও ছিল। আমি অবনীকে ফিসফিস করে বলেছিলাম, 'অবনী, আমরা খেলছি বলে কিছু

বলবে না তো?'

অবনী বলত, 'ভ্যাট। ও তো নন্দিনী, ও আবার কী বলবে রে?'

—যদি ওর বাবাকে বলে দেন?

—ওর বাবা তো মরে ভূত হয়ে গেছে! ও তো সেজোবাবুর ভাইয়ের মেয়ে!

আর সেজোবাবু, তিনি কত রাত্তিরে ফেরেন তার ঠিক আছে! যা-যা অবনীটা যেন কী, কথায় কোন রসকষ নেই। রাজা না-বলে বলত বাবু।

অবনীর ভাবভঙ্গি যেন সবজান্তার মতো। অবনী যখন এসব কথা বলত তখন ওর গলার আওয়াজ ঠিক ওর বাবার মতন শোনাত। অবনীই একদিন বলেছিল ওসব রাজা-ফাজা আজকাল আর চলে না, ধারের চোটে তো সব বন্ধক পড়ে আছে।

যাই হোক, রাজার মেয়ে না হোক তবু তো রাজবাড়ির মেয়ে, আমার চোখে তবু তো রাজবাড়ির মেয়ে, আমার চোখে তবু নন্দিনী ছিলেন রাজকুমারী। অমন রূপসী আমি আর কখনো দেখিনি, রাজকুমারী ছাড়া ওরকম রূপ হয়না। দক্ষিণের কারুকার্য-করা বারান্দায় ওঁকে দেখলেই আমি পলকহীনভাবে তাকিয়ে থাকতাম খেলাটেলা ভুলে। ওঁর রূপের মধ্যে একটা অপরূপ গাম্ভীর্য ছিল। আমাদের ক্লাবের সবাই যে তখন কচিছেলে তাও নয়, দু-একজনের বেশ গোঁপ উঠেছে, এবং আমি চিরকালই একটা ভীতু-ভীতু হলেও আমাদের অনেকেই তখন রাস্তায় স্কুলের মেয়েদের দেখে সিটি মারতে শিখেছে। তবে নন্দিনীর দিকে সেরকম করার সাহস আর কারুর ছিলনা। একমাত্র আমারই সাহস ছিল নন্দিনীর দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে থাকার।

নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগও আমিই পেয়েছিলাম। সেদিন দুরন্ত হাওয়ায় আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলা একবারে পণ্ড, পালকের বলটি এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছে—আমরা হাসাহাসি করছি। এমন সময় দক্ষিণের বারান্দা থেকে একটা ব্লাউজ উড়ে এসে মাঠে পড়ল। নন্দিনী এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন, রাজকুমারী তো, তাই আমাদের বললেননা সেটা দিয়ে আসতে, শুধু কণ্ঠস্বর একটু উচ্চে তুলে ডাকলেন, শ্রীমন্ত! বুঝলাম চাকরকে ডাকছেন। অবনী আমায় বলল, 'এই নীলু, যা না, জামাটা দিয়ে আয়-না! ঐ যে পাশ দিয়ে সিঁড়ি।'

কী বোকা অবনীটা, অমন সুযোগ পেয়েও নিজে না নিয়ে আমাকে দিয়ে দিল। আমি তৎক্ষণাৎ জামাটা তুলে সিঁড়ির দিকে ছুটলাম।

সিঁড়িটা অন্ধকার, দেয়ালের গায়ে হাত দিলে ঠাণ্ডা লাগে। উঠোনের আলো থেকে হঠাৎ সেই অন্ধকার সিঁড়িতে আসায় আমার যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেল, আমার চারপাশে শুধু অন্ধকার। তখন আমি ভাবলাম, আমায় তো কেউ দেখতে পাচ্ছে

না। সেইজন্য খুব সাবধানে গোপনে আমি ব্লাউজটা নাকের কাছে এনে গন্ধ নিয়েছিলাম—রাজকুমারীর শরীরের ঘ্রাণ। জানিনা, সেই ব্লাউজে শুধু সাবানের গন্ধ ছাড়া আর-কিছু গন্ধ ছিল কি না। কিন্তু আমি স্পষ্ট রাজকুমারীর ঘ্রাণই পেয়েছিলাম, সে ঘ্রাণ আজও নাকে লেগে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওঠার মুখেই নন্দিনী দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি হাত বাড়িয়ে জামাটা দিলাম। তিনি সেটা নেবার পর তবুও আমি দাঁড়িয়ে রইলাম বোকার মতন। ভেতরের ঘরে একটি পুরুষ কণ্ঠ কাকে যেন ধমকাচ্ছে, একটি নারীকণ্ঠ কাঁদছে। আমি তবু দাঁড়িয়ে রইলাম। নন্দিনী এবার আমার দিকে অল্প হেসে বললেন, 'আচ্ছা, ঠিক আছে।'

ঐ তো একটিবার আমার দিকে চেয়ে হেসেছিলেন, ঐ তো একটিমাত্র কথা বলেছিলেন—সেজন্য নন্দিনীর আমাকে মনে থাকবে কেন? কিন্তু আমার মনে আছে, আমার মনে আছে নন্দিনীর মুখ, তাঁর কণ্ঠস্বর। তাই অতবছর পরও আমি একপলক দেখেই একটা কথা শুনেই চিনতে পেরেছিলাম। চিনতে পেরে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

পনেরো-কুড়িবছর কেটে গেছে, আমাদের সেসব ছেলেবেলার জীবন কোথায় হারিয়ে গেছে, পুরোনো পাড়া ছেড়ে চলে গেছি অনেকদিন। একবার যেন দেখেছিলাম সেই রাজবাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, কোন এক মারোয়াড়ি সেটা কিনে নিয়ে হলদে-সবুজ ক্যাটকেটে রং লাগিয়েছে, সিংহদ্বারে লাগিয়েছে কোলাপসিবল গেট কিন্তু এখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় কোথায়? এখন পৃথিবীর বড়-বড় সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছি তাহলেও অতদিন পর নন্দিনীকে ঐ অবস্থায় দেখে আঁৎকে না-উঠে পারলামনা।

নীলরতন হাসপাতালের সামনে নন্দিনীকে দেখলাম একটা রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করতে। রিক্সাওয়ালা চেঁচাচ্ছে—না মাইজী ষাট নয়া বোলা হ্যায়—। নন্দিনী তাকে ধমকে বলছেন, নেই আট আনা দিয়া। আমি একমুহূর্তেই চিনতে পারলাম। নন্দিনীর পরনে একখানা সাধারণ শাড়ি সন্ধেবেলায় পড়ন্ত রোদ্দুরের রেখায় ওঁকে যেমন দেখেছি—তার তুলনায় এখন দুপুরের কটকটে রোদ্দুরে ওঁর মুখ অনেক সাধারণ, কিছুটা ম্লান ও কর্কশ, নাকের ওপর সামান্য মেছেতা হয়েছে, তবু সেই রাজকুমারী, সেই নন্দিনী, কোন ভুল নেই। আমার খুব মন খারাপ লাগল।

পরক্ষণেই ভাবলাম খারাপ কী আছে, রাজকুমারী পথে নেমে এসেছেন আর-পাঁচজনের মতন। আর-পাঁচজনের মতনই তাঁকে দুপুরের রোদ্দুর সইতে হচ্ছে —এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু নন্দিনীদের বাড়িতে জুড়িগাড়ি ছিল, এখন তাঁকে রিক্সা চড়তে দেখে দুঃখ পাইনি, দুঃখ পেয়েছি সামান্য দশনয়া পয়সা নিয়ে দরাদরি করতে

দেখে। মোহর ছুঁড়ে দেবার কথা ছিল ওঁর তার বদলে—নন্দিনী তখনও নাছোড়, তিনি রিক্সাওয়ালাকে ভাঙা হিন্দিতে বলছেন এই তো থোড়া দূর এর জন্য ষাট নয়া? না, আট আনাসে যাস্তি নেই দেগা। রিক্সাওয়ালা ক্রমশ গলা চড়াচ্ছে—তাতে বোঝা যায়, ঝগড়া অনেকক্ষণ চলছে—।

আমার মনের মধ্যে একমাত্র একজন রাজকুমারীর মুখ ছিল, তাকেও এরকম ভেঙে দেওয়া তোমার উচিত না নন্দিনী। আমি এখন আর রূপকথার জগতে নেই, তবু হৃদয় থেকে সব রাজকুমারীদের নির্বাসনও তো দিতে পারি না। নন্দিনী, এরচেয়ে ছেলেবেলায় তোমাকে না-দেখলেই ভালো হতো। তাহলে অদেখা রাজকুমারীরা কোনদিন রিক্সাওয়ালার সঙ্গে আমার সামনে দরাদরি করতনা।

এইসময় একটা ছোট ঘটনা ঘটল। ট্রামকে পাশ কাটাতে গিয়ে একটা বিশাল মোটর গাড়ি রাস্তার ধার ঘেষে এসে সেই দাঁড়ানো রিক্সাটাকে আস্তে ছুঁয়ে গেল। রিক্সাটা, সঙ্গে-সঙ্গে এসে পড়ল নন্দিনীর গায়। আমি সাহায্যের জন্য এগিয়ে গেলাম। তার আগেই মোটরগাড়িটা থেমেছে, টুপি মাথায় একজন মারোয়াড়ি নেমে এসে রিক্সাওয়ালার দিকে ভ্রূক্ষেপ না-করে নন্দিনীর দিকে সোনা বাঁধানো দাঁতে হেসে বলল, 'এক্সকুজ মি, আই আম স্যারি, মাফ কিজিয়ে আই আম ওফুলি স্যারি, আপকো চোঠ লাগা?'

নন্দিনী অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, 'না।' মারোয়াড়িটি তবুও বিগলিত হেসে বলল, 'আপনাকে বাড়ি পৌঁছায়ে দিসি্য চলেন না? এসব রিক্সাওয়ালারা হয়েছে এমন হারামি—।' নন্দিনী আবার বলল, 'না, থাক দরকার নেই, আমি এখানেই এসেছি।' লোকটি তবু বললে, 'হামি গিল্টি ফিল করসি। আপনি কাজ সারিয়ে লিন, হামি আপনাকে বাড়িমে পৌঁসায়ে।'

হঠাৎ নন্দিনী সোজা হয়ে উঠল, তীব্র গলায় বলল, 'আপনি অত কাছে এসে কথা বলছেন কেন? সরে যান—। ঐ রিক্সাওয়ালার সঙ্গে কথা বলুন আপনি।'

মারোয়াড়িটি সঙ্গে-সঙ্গে নুনের ছিটে-লাগা কেঁচোর মতন গুটিয়ে গেল। সেই মুহূর্তে, ক্ষীণ হলেও, আমি আর-একবার নন্দিনীর মুখে রাজকুমারীর মহিমান্বিত রূপের ঝিলিক দেখতে পেলাম।

১৬

—আপনি আপনার ছেলেকে ভালোবাসেন?

টিকিট চেকারটি সচকিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ আবার

কী প্রশ্ন? নিজের ছেলেকে কে না ভালোবাসে?'

—আপনার ছেলে আপনাকে খুব ভালোবাসে?

—ঐ যে বললাম আপনাকে, ছেলেটা হয়েছে এমন, মায়ের চেয়ে বাপের ওপরেই বেশি টান—কিছুতেই ছাড়তে চায়না, নাইটডিউটির সময় তো ওকে এড়িয়ে আসাই মুশকিল আমার। শেষকালটায় বাথরুমে যাবার নাম করে—একরকম পালিয়েই আসতে হয়— বুঝলেন না, চারমেয়ের পর একছেলে তো, আদরটা একটু বেশিই।'

—ছেলের নাম কী?

—দেবব্রত। ডাক নাম কিন্তু দেবু নয়। দেবু যেন একটু বুড়ো বুড়ো—ওর ডাকনাম মানিক, আমার বউ তো মশাই চেয়েছিল ছেলের নামের জন্য তারাশঙ্কর বাঁড়ুজ্যে কিংবা বনফুলকে চিঠি লিখবে, তা আমি বললাম ওঁরা ব্যস্ত মানুষ—

ভদ্রলোক গড়গড় করে অনেককথা বলতে লাগলেন। বহুদিন বোধহয় আমার মতন এরকম নিরীহ শ্রোতা পাননি। মধ্যরাত্রে ট্রেন ছুটছে প্রচণ্ড বেগে, দারুণ শীত, কামরায় বেশি লোক নেই—বেশ হাত-পা মেলে ছড়িয়ে শোওয়া যায়, শরীরটা চাইছিলও শুয়ে পড়তে, কিন্তু ইচ্ছে করেই বসে আছি। আমাকে রাত তিনটের সময় নামতে হবে রাজখারসোয়ানে। এখন একবার ঘুমিয়ে পড়লে—রাত তিনটেয় ঘুম ভাঙা অসম্ভব—স্টেশন পেরিয়ে যাবে। টিকিট চেকারটি নিজের কাজ সেরে আমার পাশেই বসেছিলেন —সুতরাং আমিই নিজের থেকে ওঁর সঙ্গে আলাপ শুরু করেছি। আর এরকম মাঝবয়সী লোকদের সঙ্গে আলাপ জমাবার সবচেয়ে সহজ উপায় তাদের ছেলেমেয়ের গল্প বলার সুযোগ দেওয়া।

লোকটি ছেলের কথায় একেবারে গদগদ। এক ছেলে ছাড়া তাঁর যে আরও চারটি মেয়েসন্তান আছে—তাদের কথা ভুলেই গেছেন, শুধু ছেলে কী করে, কেমন করে খায়, তার কত বুদ্ধি—এই নিয়ে সাতকাহন।

আমি মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করছিলাম। মাছ ধরে তুলবার আগে যেমন বঁড়শিতে অনেকখানি সুতো ছাড়তে হয়—আমিও তেমনি লোকটিকে কিছুক্ষণ সুযোগ দিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেকে কী পড়াবেন ঠিক করেছেন?'

—এখন কী পড়াশুনোর কথা? মোটে তো সাড়ে-তিনবছর বয়েস।

—তবুও আগে থেকে প্ল্যান না-করলে আজকাল ছেলেমেয়েদের...

—ভাবছি, হাজারিবাগে মিশনারি স্কুলে দেব—ওখানে আবার বোর্ডিং তো —আমার ওয়াইফ কি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারবে... আমারও হেঁ—হেঁ—

—আর্টস পড়াবেন, না সায়েন্স?

—আর্টস পড়ে আজকাল কী হয়? কিছু না! সায়েন্সেই দেব—তারপর যদি

ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে...আজকাল অবশ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেও বেকার—

—ছেলেকে আপনার মতন রেলের চাকরিতে ঢোকাবেননা?

—রেলের চাকরি? ছ্যা-ছ্যা—এরকম ছ্যাঁচড়া কাজ—আমার তেইশবছর সার্ভিস হয়ে গেল, তবু তো প্রমোশন পেলামনা সেরকম, না মশাই ছেলেকে আর এ-লাইনে দেবনা।

—কেন, রেলের চাকরিতে তো আয় কম নয়। আপনি তো আজ এইরাত্রেই অন্তত তিরিশ টাকা রোজগার করলেন দেখলাম। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে কি এর চেয়ে বেশি টাকা রোজগার করতে পারবে?

লোকটি তীক্ষ্ণ চোখে আমার দিকে তাকালেন। আমিও সোজাসুজি তাকিয়ে রইলাম, চোখ সরিয়ে নিলামনা। তখন থেকে রাগে আমার শরীর জ্বলছিল। লোকটিকে চরম আঘাত দেবার জন্য আমি মনে-মনে তৈরি হচ্ছিলাম। ডালটনগঞ্জ থেকে আসার পথে পুরো রাস্তাতেই জোচ্চুরির একটা বিরাট জাল আমার চোখে পড়েছিল। এ-লাইনে থার্ডক্লাসে অধিকাংশ যাত্রীই আদিবাসী ওরাওঁ-সাঁওতাল কিংবা দরিদ্র বিহারী—গোটা কামরায় আমার মতন তথাকথিত ভদ্রশ্রেণীর লোক মাত্র পাঁচ-সাতজন, এবং আমরাই শুধু টিকিট কেটেছি। বাকি আর একজনও টিকিট কাটেনি। টিকিট কাটার কোন রেওয়াজই নেই মনে হল ওদের মধ্যে। রাত্তিরবেলা টিকিট কাউন্টারে লোক থাকেনা সবসময়—থাকলেও একজনকে টিকিট দিতেই অনাবশ্যক দেরি করে—খুচরো পয়সা না-থাকার ওজর তুলে টিকিটকাটা বন্ধ রাখে, ইতিমধ্যে ট্রেন এসে যায়—সবাই তখন টিকিটের লাইন ছেড়ে দৌড়ে ট্রেনে উঠতে যায়—গেটের কাছে একজন চেকার দাঁড়িয়ে থাকে হাত পেতে—সবাই তার হাতে সিকি-আধুলি গুঁজে দিয়ে যায়। এখন কামরার মধ্যে ওরা মড়ার মতো পড়ে-পড়ে ঘুমোচ্ছে—একটু আগে এই টিকিট-চেকার ভদ্রলোকটি যখন সবাইকে ধাক্কা মেরে টিকিট চাইছিলেন, প্রত্যেকেই চোখ না-খুলেই হাত বাড়িয়ে একটি করে আধুলি বাড়িয়ে দিচ্ছিল। আমিই শুধু বোকার মতন সাড়ে-পাঁচটাকা খরচ করে টিকিট কিনেছি। অন্তত সত্তর-আশিটি আধুলি এই চেকার ভদ্রলোকের পকেটে ঝনঝন করছে।

ভদ্রলোক একটু কঠোরভাবে বললেন, 'তার মানে?'

আমি হেসে বললাম, 'মানে তো আপনিও জানেন, আমিও জানি। রাগ করছেন কেন? আমি তো পুলিশ নই, আপনার কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু আমার কৌতূহল মেটাচ্ছি! আপনার যা রোজগার দেখলাম, তাতে মনে হয়—আপনার ছেলেকে এই লাইনে ঢোকানোই তো স্বাভাবিক।'

ছেলের প্রসঙ্গ তুলে অনেকক্ষণ কথা বলায় ভদ্রলোকের মনটা নরম হয়ে

গিয়েছিল। আমার কাছে তিনি আর লুকোলেন না। খানিকটা অনুতাপের সঙ্গে বললেন, 'এইজন্যই তো ছেলেকে আর এ-লাইনে আনবনা। আমরা এ-জীবনটা অধর্ম করে গেলাম, পেটের দায়ে অনেকরকম কাজ করেছি—কিন্তু ওকে আর এসব পাপের মধ্যে আনবনা। ও যাতে সৎভাবেই নিজেরটা নিজে, মানে বুঝলেন না, দিনকাল কি আর চিরদিন এক থাকবে? ওরা যখন বড় হবে তখন অবস্থা অনেক পালটে যাবে—তখন রেলেও কি আর এসব চলবে ভাবেন?'

—তাহলে আপনার মনে হয় দিনকাল বদলাবে?

—বদলাবে না? নিশ্চয় বদলাবে!

—কিন্তু আপনার এই বাইশবছর সার্ভিসে কিছু বদলেছে দেখলেন? নাকি অবস্থা আগের চেয়েও খারাপ হয়েছে! ব্রিটিশ আমলে কি এত বিনাটিকিটে লোক যেত?

—সেকথা ছাড়ুন, কিন্তু অবস্থা এরকম থাকবেনা। আমি বলে রাখছি, দেখবেন, আপনারও তো বয়েস বেশি না ; দেখে যাবেন দেশের অবস্থা এরকম থাকবেনা —পরবর্তী যুগের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি ইয়ে, মানে তারা অন্যায় সহ্য করবেনা—

খুব আশাবাদীর মতন ভদ্রলোকের চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মাফলারটা ভালো করে গলায় জড়িয়ে তিনি ভবিষ্যতের একখানা মহান ছবি আঁকতে লাগলেন। আমি এবার ওঁকে চরম অস্ত্রখানা দিয়ে আঘাত করার জন্য শান দিতে লাগলাম।

আমি খুব বিনীত কাঁচুমাচু ভাবে বললাম, 'দেখুন, অনেকদিন থেকেই আমার একটা কৌতূহল আছে, যদি কিছু মনে না-করেন, একটা প্রশ্ন করব?'

—করুন-না। যা খুশি আপনার বলুন, আমাদের আর মনে করা না-করা।

—আচ্ছা আপনার কি মাঝে-মাঝে এরকম ভয় হয়না—যে, আপনার ছেলে বড় হয়ে উঠে আপনাকে আর একটুও ভালোবাসবে না, একটুও ভক্তিশ্রদ্ধা করবেনা?

—সে তো আজকাল অনেক ছেলেমেয়েই—সেকথা কে বলতে পারে? তবে ঠিক মতন যদি শিক্ষা দেওয়া যায়—ভদ্র-সভ্য ছেলে কি আর একেবারেই নেই বা থাকবে না বলতে চান?

—না, আমি তা বলতে চাইনা। ঠিক মতন শিক্ষা পাওয়া ছেলেদের কথাই আমি বলছি। ঠিক মতন শিক্ষা পেলে আপনার ছেলে কি আপনাকে ঘেন্না করতে শুরু করবেনা?

—ঘেন্না করবে? নিজের বাবাকে? শিক্ষা মানে এই?

—শিক্ষা পেলেই সে ন্যায়-অন্যায় স্পষ্ট বুঝতে পারবে। তখন কি সে বুঝতে পারবেনা যে, তার বাবা একজন চোর? তার বাবা এইসব গরিব-দুঃখী সাঁওতালদের কাছ থেকে ঘুষ নিয়ে তাকে লেখাপড়া শিখিয়েছে। ঐ যারা লেংটি পরে থাকে, শীতের রাত্রেও একটুকরো ন্যাতা জড়িয়ে থাকে—তাদের হাত থেকে আধুলি নিয়ে আপনি আপনার ছেলেকে জামাকাপড় কিনে দিয়েছেন! এতে কি তার প্রচণ্ড একটা রাগ হবেনা? কিছু মনে করবেন না, আমি শুধু আপনার একার কথাই বলছিনা—অনেকদিন থেকেই আমার জানার কৌতূহল—যারা চুরি কিংবা ব্ল্যাকমার্কেট করে, যারা ঘুষ নেয়, যারা মানুষকে ঠকিয়ে নিজের বাড়ি-গাড়ি বানায়, তারা আর সবকিছু অগ্রাহ্য করতে পারে—তারা দেশের দুঃখ-দুর্দশার কথাও হয়তো ভাবে কিন্তু একথাও কি তারা একবারও ভাবেনা—যে তাদের নিজেদের ছেলেমেয়েরাই একদিন তাদের ঘেন্না করবে! নিজের ছেলেমেয়ের ভালোবাসা পেতেও তারা চায়না? নাকি এইসব চোরদের ছেলেমেয়েরাও চোর হয়? তাদের আরও বড় চোর করে তোলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়। আপনার ছেলেকেও কি আপনি চোর করবেন!

—না, না নিষ্পাপ শিশু, তাকে আমি...আমি ওকে সুশিক্ষাই দেব। তাতে যদি ও আমাকে ঘেন্না করে তো করুক! আপনি বুঝবেন না, এখানে এ-লাইনে আমি যা করছি —তা না-করেও উপায় নেই, অনেকেই এটা করছে, আমি একা যদি ভালো হবার চেষ্টা করি—তাতে আমিই শুধু ঠকব, সবাই আমাকে বলবে বোকা —আমি একা বেশি বাড়াবাড়ি করলে, একা-একা সৎ হবার চেষ্টা করলে হয়তো তারাই আমার বিরুদ্ধে...তবু একজন রুখে দাঁড়ানো উচিত ছিল, আমি পারিনি, সংসর্গ দোষে আমিও অসৎ হয়েছি—কিন্তু আগামীকালের ছেলেমেয়েরা নিশ্চয়ই এ-সবকিছু ভেঙে ফেলবে—আমি আমার ছেলেকে সেই শিক্ষাই দেব—তার ফলে যদি ওর বাবার প্রতিও ওর ঘেন্না আসে তো আসুক—তবু ও তো সৎ হবে—এই আমার সান্ত্বনা।

১৭

অনাদিবাবুকে দেখতাম ভোর সাড়ে-চারটায় উঠে বাগানে যেতেন। দেখতাম অথবা শুনতামও বলা যায়। আমি তো জীবনে সূর্যোদয়ই দেখেছি কয়েকবারমাত্র। বস্তুত চড়া লাল রং আমার সহ্য হয়না বলেই ভোরের সূর্য আমি পছন্দ করিনা, ঘুম ভেঙে চোখ খুলে তাকাই সেই তখন, যখন ভোরের লাল সূর্য বেশ হলদেটে হয়ে

এসেছে। এবং শেষ বিকেলেও আমি সাধারণত অফিসে বা চায়ের দোকানে বন্দী থাকি বলে—গাঢ় সূর্যাস্তও আমার জীবনে খুব বেশি দেখা হয়ে ওঠেনি। আমার দিন কাটে ফ্যাকাসে—ঝাপসা রঙের মধ্যে। কিন্তু রিটায়ার্ড উকিল অনাদি সেনগুপ্ত গত পঞ্চাশ বছর ধরে নাকি ভোর সাড়ে-চারটার সময় ঘুম ভেঙে বাইরে আসেন।

বছর দুয়েক আগে আমি কিছুদিন বর্ধমানে ছিলাম। আমাদের বাড়ির পাশেই অনাদিবাবুর বাড়ি, আমার শোবার ঘরের পিছনেই তাঁর বাগান। প্রত্যেক দিন ব্রাহ্ম মুহূর্তের আগে বাগানে অনাদিবাবুর গান ও নাচে আমার ঘুম ভাঙে। অনাদিবাবু যখন বাগানে আসেন, তখন তাঁর হাতে জলের ঝারি ও খুরপি, পরনে হাফপ্যান্ট ও পায়ে ঘুঙুর। গলায় রামপ্রসাদী গান, গানের সঙ্গে তাল ঠোকেন ঘুঙুর বাজিয়ে। এক-একদিন ঘুম ভেঙে, তখনও সূর্য ওঠেনি, শিয়রের জানালা দিয়ে আমি তাকিয়ে দেখেছি, বাগানের প্রত্যেকটি ফুলগাছের পাশে ঘুরে-ঘুরে অনাদিবাবু নেচে-নেচে গান করছেন, আমায় দে মা পাগল করে, ব্রহ্মময়ী—। তখন হয়তো কোন স্বপ্ন দেখতে-দেখতে আমার ঘুম ভেঙেছে সেই অপ্রাকৃত আলোয়। অনাদিবাবুর অস্তিত্বও আমার কাছে অপ্রাকৃত মনে হয়, কিছুক্ষণ দুর্বোধ্যতার বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আবার আমি বিছানায় পাশ ফিরে ভাঙা ঘুম মেরামত করার চেষ্টা করেছি।

অনাদিবাবু কিন্তু পাগল বা বাতিকগ্রস্ত নন। গান বা নাচের সঙ্গে গাছপালার ফলন বৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে—এরকম বিশ্বাসও তাঁর নেই। আসলে তাঁর খুব সাপের ভয়, বাগানে যদি সাপ থাকে এই আশঙ্কায় তাঁর গান ও নাচ—শব্দ পেলেই নাকি সাপ দূরে চলে যায়। এবং ওঁর ঘুঙুর পরার খবর ওঁর বাড়ির বাইরে আমি ছাড়া আর তো কেউ জানেনা। বাগানের সম্পূর্ণ পরিচর্যা সেরে সাতটা আন্দাজ তিনি আমার জানলার পাশে এসে গলা খাকারি দিয়ে ডাকতেন, 'কী, ঘুম ভাঙল? ইয়ংম্যানের পক্ষে এত ঘুম—আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ—এই হচ্ছে গিয়ে...।' তখন আমি গভীর ঘুমে মগ্ন এবং সকালের ঘুম একডাকে ভাঙেনা।

অনাদিবাবুকে আমার গোড়ার দিকে বেশ ভালোই লাগত। রিটায়ার্ড লোকেরা সাধারণত একটু বেশি কথা বলেন, এবং উনিও সুযোগ পেলেই আমাকে ধরে রাজ্যের কথা শোনাতেন, কিন্তু ওঁর কথা শুনতে প্রথম-প্রথম আমার মোটেই খারাপ লাগতনা। লোকটির পুষ্পপ্রীতি ছিল অসাধারণ। স্বাস্থ্যবাতিক কিংবা অন্যকিছুর জন্যই ভোরে ওঠা নয়, শুধুই বাগানের জন্য। শুধু সকাল নয়, সারাদিনই প্রায় বাগানে কাটে তাঁর। এবং রিটায়ার করার বহু আগে থেকেই এই শখ। বেশ বড় বাগান, অনেক ফুল ফোটে— যদিও অনাদিবাবু ফুল বিক্রিটিক্রি করার কথা ভাবেননা, ফুলের আর কোনই প্রয়োজন নেই। তিনি ফুলগুলোকে নিষ্কামভাবে ভালোবাসেন। নতুন গোলাপের চারা লাগাবার পর ওর ধৈর্য ডারুইনকেও হার

মানায়। যতক্ষণ-না সেই গাছে ফুল ফুটছে—তিনি একাগ্রভাবে সেদিকে চেয়ে থাকেন। সকালবেলা যেদিন এসে বলেন, 'জানেন এত চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলামনা'—তখন ওঁর দীর্ঘশ্বাস ও করুণ মুখচোখে ফুটে ওঠে পুত্রশোক, কিন্তু আসলে মারা গেছে একটা চন্দ্রমল্লিকার চারা। মফস্বল আদালতের উকিল ছিলেন, জীবন কেটেছে নোংরা আদালতঘরে, চোর জোচ্চোর আর বদমাসদের সঙ্গে, তবু কী করে ওঁর এমন সৌন্দর্যবোধ রয়ে গেছে ভেবে আমি আশ্চর্য হতাম। উনি আমাকে বিভোর হয়ে বলতেন, 'ক্যালিফোর্নিয়ান পপি যখন প্রথম ফোটে—ফুলের ভেতরটায় তাকিয়ে দেখবেন, কী নরম রং, ওরকম রং আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে দেখবেননা!... ঐ ক্যামেলিয়াটা আজ ফুটল, দেখুন, দেখুন, যেন ঠিক রাজকন্যার মতন তাকিয়ে আছে।... ওটা কী ফুল বলুন তো? চিনতে পারলেননা? কাঞ্চন! ওকি, আপনি অতসীও চেনেননা? অবশ্য এরকম ডবলঅতসী আমিও আগে দেখিনি। ওটা? ওটা বিদেশি ফুল—ওর নাম নাসটেসিয়ান। আহা, এই বেলফুলগুলো দেখুন, বড় অভিমানী ওরা, একটু যত্নের ত্রুটি হলেই, কিন্তু কী রূপ, আহা, চক্ষু সার্থক!'

ফুল সম্পর্কে আমার অবশ্য তেমন কোন ঔৎসুক্য নেই। কিন্তু ফুল সম্পর্কে অনাদিবাবুর ওরকম আন্তরিক ভালোবাসা দেখতে আমার ভালোই লাগত। তাছাড়া, আমার শিয়রের জানলা দিয়ে যখন তাঁর বাগানের নানান ফুলের সম্মিলিত সুগন্ধ ভেসে আসত— তখন আমি বিনাপয়সায় আনন্দ উপভোগের স্বাদ পেতাম। অনাদিবাবুর তেমনকিছু শিক্ষাদীক্ষা ছিলনা, কথা বলে দেখেছি, শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কে ওর কোন জ্ঞানই নেই। বেশির ভাগ লোকই যেরকম হয়, ইস্কুল-কলেজে পড়েছেন ডিগ্রি নেবার জন্য, বাকি জীবনটা খরচ করেছেন জীবিকার জন্য, এর বাইরে আর-কিছু নেই—তবু এই অপ্রয়োজনীয় পুষ্পপ্রীতি ওঁর মধ্যে এল কী করে? তবে কি ওঁর ভিতরে কোন আলাদা সৌন্দর্যবোধ আছে—যা শিক্ষা কিংবা প্রেরণার অপেক্ষা রাখেনা? কিন্তু এই সৌন্দর্যবোধটাই বা কী করে একতরফা হয়। অনাদিবাবুর বাড়িতে গিয়ে কিন্তু আমি খুবই দমে গেছি!

অনাদিবাবুর বাগান ঝকমকে তকতকে সাজানো, কোথাও একটু অনাবশ্যক আগাছা বা ময়লা নেই, ছবির মতন। কিন্তু ওর বাড়িটা যাচ্ছেতাই। অনাদিবাবুর তিন ছেলে—দুই মেয়ে, বড় ছেলে অসবর্ণ বিয়ে করে আলাদা হয়ে গেছে। খুব একটা অভাবের সংসার নয় কিন্তু বাকি ছেলেমেয়েগুলোর বিশ্রী জামাকাপড়, সারা বাড়িটা অগোছালো ছন্নছাড়া। বারান্দায় বসার জায়গা, কয়েকখানা বাজে ক্যালেন্ডার ঝুলছে, কাপড়ের ওপর সুচের শেলাই-করা পুকুরপাড়ে তালগাছের একটা বিকট ছবি বাঁধানো। অনাদিবাবু স্ত্রীকে ডাকলেন 'গোবিন্দর মা' ব'লে, বললেন, 'আমাদের

ইয়েকে চা দাও এক কাপ—আবার চোদ্দঘণ্টা লাগিয়ো না!'—চা নিয়ে এল একটি চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে, যথারীতি কাপের কানাগুলো ভাঙা। মেয়েটি বলল, 'বাবা, তোমাকেও চা দেব?' অনাদিবাবু খেঁকিয়ে উঠে বললেন, 'দিবি না তো কী! আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে।' মেয়েটি চলে যাচ্ছিল, অনাদিবাবু আবার ডেকে বললেন, 'এই ভুণ্টি (বেশ দেখতে মেয়েটিকে, অথচ তার নাম ভুণ্টি) তুই আবার ব্যাঁকা সিঁথি করেছিস! ইস্কুলে গিয়ে এইসব বিবিয়ানা শিখছিস—ছাড়িয়ে দেব—।' মেয়েটি থতমত খেয়ে বলল, 'কই না তো! দিদি তো চুল বেঁধে দিয়েছে!' আমি তাকিয়ে মেয়েটির চেহারায় কোন বিবিয়ানার চিহ্ন দেখতে পেলামনা। ঐটুকু মেয়ের রঙিন ফ্রক পরাই উচিত ছিল, বেণী দুলিয়ে ছোটাছুটি করলেই ওকে মানাত বেশি, কিন্তু সেসব বোধহয় ওর বাবার পছন্দ নয়, মেয়েটি একটা সাদা রঙের (সুতরাং আধময়লা) শাড়ি-পরা, মাথার চুল পাট করে আঁচড়ানো, আজকালকার মেয়েদের ধরনে সিঁথিটা বুঝি একটু বাঁপাশে। বাবার সামনে ভয়ে মেয়েটির মুখ আড়ষ্ট। অনাদিবাবু ফের বললেন, 'দিদি? দিদি তো সিনেমা দেখে ওসব শিখছে! দাঁড়া আজ আসুক হারামজাদী!' বলেই অনাদিবাবু ফড়াৎ করে সিকনি ঝেড়ে চেয়ারের গায়েই হাত মুছলেন। ঘেন্নায় আমার গা বমি-বমি করছিল, কোনক্রমে বিদায় নিয়ে ওর ফুলবাগানে মধ্য দিয়ে আমি ফিরে এলাম।

এ কী ধরনের সৌন্দর্যবোধ? ভাষায় রুচিজ্ঞান নেই, আচার-ব্যবহার অসুন্দর, অথচ ফুলের সৌন্দর্যকে ভালোবাসার কী যুক্তি? এখনো কানে ভাসে অনাদিবাবুর কথা : সব সাদাফুলই কিন্তু একরকম সাদা নয় বুঝলেন, রজনীগন্ধা আর গন্ধরাজ —এ-দুটো হাতে নিয়ে দেখুন, দুটো দুরকম সাদা। পপি ফুলের ভেতরে তাকিয়ে দেখবেন, আহা কী নরম রং!— এই অনাদিবাবুকেই দূর থেকে চিৎকার করতে শুনেছি : এই লেটো (ছেলের নাম) আবার রেডিও খুলেছিস! দিনরাত খালি গান-বাজনা—হারামজাদা ছেলে, জুতিয়ে তোমার—। দুর্বোধ্য মানুষ!

এরকম মানুষ আমি আরও অনেক দেখেছি। সেজো মাসিমাকে দেখেছি, গল্প-উপন্যাস পড়ার কী দারুণ নেশা। রোজ লাইব্রেরি থেকে বই আনা চাই-ই। শিকার কী অ্যাডভেঞ্চার তাঁর ভালো লাগেনা, তাঁর চাই শুধু প্রেমের কাহিনী। এবং সে-প্রেমও ব্যর্থ হলে চলবেনা। প্রায়ই আমাকে বলতেন, 'দূর, দূর, এ-কী বই এনেছিস! একেবারে বাজে বই। শেষ পর্যন্ত ছেলেটা-মেয়েটার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল!'—সেই সেজো মাসিমাকেই দেখেছি, কোথাও চেনাশুনো কেউ প্রেম করে বিয়ে করলেই তিনি রেগে আগুন হয়ে যেতেন! বলতেন, 'ছি ছি, বাবা-মার কথা একবার ভাবল না, ছি ছি—।' আমার মামাতো ভাই এম-এ পড়ার সময় ক্লাসের একটি মেয়েকে বিয়ে করল বলে মাসিমা সে-বিয়েতে নেমন্তন্নই খেতে গেলেননা!

—এরও না হয় মানে বুঝি, কিন্তু শশাঙ্কবাবুর চরিত্রর কী মানে হয়?

শশাঙ্কবাবু একজন প্রৌঢ় শিক্ষক, আমাদের প্রতিবেশী। জোয়ান দশাসই চেহারা, শিক্ষক হবার বদলে মিলিটারি অফিসার হলেই তাঁকে মানাত। সকালে-দুপুরে মাস্টারি, তারপরও টিউশানি—দিনরাত অর্থোপার্জনের নেশায় কাটছে। কিন্তু ওঁরও একটা অদ্ভুত নেশা আছে। বাড়ি ফেরার পথে তিনি প্রায়ই একটা কুকুরছানা কিংবা বিড়ালছানা নিয়ে আসেন। রাস্তার পাশে যদি দেখেন কোন অসহায় বিড়ালছানা কিংবা কুকুরছানা মিঁউ-মিঁউ বা কেঁউ-কেঁউ করছে, তিনি জলকাদা-মাখা অবস্থাতেও তাকে বুকে তুলে আনবেন। এই দুর্মূল্যের দিনেও খেয়ে ওঠার পর তিনি আট-দশটা কুকুরকে রুটি ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাওয়ান। অনেকে বাড়ির বেড়াল পার করার জন্য শশাঙ্কবাবুর বাড়ির সামনে ছেড়ে দিয়ে আসে। ওঁর পাশের বাড়ির ভদ্রলোক শখায় পেয়ে চারটি মুরগি কিনেছিলেন একবার, প্রত্যেক সপ্তাহে একটি করে খাবেন—এই মতলবে। তার মধ্যে দুটো মুরগি সকালবেলা শশাঙ্কবাবুর পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। তিনি তখন মুড়ি খাচ্ছিলেন, দুটো মুড়ি ছড়িয়ে দিলেন ওদের জন্য। সেগুলো মুহূর্তে শেষ করে মুরগি দুটো আবার মুখ তুলে চাইল। শশাঙ্কবাবু হাসতে-হাসতে ছেলেমেয়েদের ডেকে বললেন, দ্যাখ, মুরগিদুটো আমার কীরকম পোষা হয়ে গেল, হাত থেকে নিয়ে মুড়ি খাচ্ছে!—তারপরই শশাঙ্কবাবু চলে গেলেন তাঁর প্রতিবেশীর কাছে, ও মুরগিদুটো মারা চলবেনা। অনেক ঝুলোঝুলি করে তিনি সে-দুটোকে কিনে নিলেন, সে-দুটো বাড়িতেই থেকে গেল। ছাগলের বাচ্চা কোলে নিয়ে শশাঙ্কবাবুকে ছুটির দিনে মর্নিং ওয়াক করতেও আমি দেখেছি। পিছনে চলেছে কুকুরের পাল।

শশাঙ্কবাবুকে কি দয়ালু লোক বলব? ইস্কুলে ছাত্ররা ওঁর নাম দিয়েছে যমরাজ। ছেলেরা ওঁকে যমের মতোই ভয় করে এবং ওর হাতের থাপ্পড় খায়নি—এমন ছেলে একটিও নেই। ঐ বিশাল পুরুষের হাতের থাপ্পড় যে কী ভয়াবহ তাও অনুমান করা যায়। শুনেছি ঐ ইস্কুলের ভোজপুরী দারোয়ানকে কী যেন কারণে তিনি একবার চড় কষিয়েছিলেন, সে অজ্ঞান হয়ে যায় এবং পরে চাকরি ছেড়ে দেয়।

আমি শশাঙ্কবাবুর ছাত্র ছিলামনা, কিন্তু ওঁর নিষ্ঠুরতার কিছু কিছু কথা জানি। এক রবিবার সকালে আমি কোন কারণে ওঁর বাড়িতে গিয়েছিলাম। কথাবার্তা বলছি, এমন সময় একটা বাচ্চা ভিখারি মেয়ে ভিক্ষা চাইতে ওঁর বারান্দায় এসে দাঁড়াল। কথা থামিয়ে শশাঙ্কবাবু ক্রুদ্ধ চোখে মেয়েটার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'একেবারে বারান্দার ওপর উঠে এসেছে? অ্যাঁ? যত রাজ্যের অজাত-কুজাত ছোটলোক—একেবারে ঘরের মধ্যে, সাহস বেড়ে গেছে, না?' বলতে-

বলতেই উঠে গিয়ে শশাঙ্কবাবু সেই ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মেয়েটির কান ধরে মুচড়ে দিলেন। ঐ বিশাল পুরুষের হাত এবং রোগা-পাতলা মেয়েটির কান, মেয়েটা তীব্রভাবে কেঁদে উঠল আর সঙ্গে-সঙ্গে তার কানের গোড়া থেকে রক্ত পড়তে লাগল। শশাঙ্কবাবু বললেন, 'দূর হ!' শশাঙ্কবাবুর ঘরে-বারান্দায় কুকুর-বেড়াল-ছাগল মুরগি যথেষ্ট ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার পাশেই পড়ল মেয়েটির কয়েক ফোঁটা রক্ত। আমি আবার গাঢ় লাল রং দেখতে পারিনা—তাড়াতাড়ি চলে এলাম সেখান থেকে।

একদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে শুনলাম, শশাঙ্কবাবুর ছোট ছেলেটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ছেলেটা যখন খেতে বসেছিল, একটা কুকুর বাচ্চা এসে একেবারে ওর ভাতের থালায় মুখ দেয়। রাগের চোটে ছেলেটা, মোটে এগারো বছর বয়েস, গেলাশ ছুঁড়ে মারে কুকুরটার দিকে। কুকুরটার ঠ্যাং খোঁড়া হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে সমস্ত পোষা জন্তু-জানোয়ারের একবার খবর নেওয়া শশাঙ্কবাবুর অভ্যেস। সেদিন ফিরে ঐ ব্যাপার দেখে তিনি ছেলেকে তুলে প্রবল আছাড় দিয়েছেন। ছেলেটা সেই থেকে রক্তবমি করছে, বাঁচবে কি না সন্দেহ। কী বলব একে? দয়া?

১৮

মাত্র চারজন যুবক, তারা প্রায় আড়াইশো নারী-পুরুষকে দমন করে রেখেছে।

দেখলে বেশ আনন্দ হবারই কথা। যৌবনের এই প্রচণ্ড শক্তি ও তেজই তো কাম্য। হোক-না একটু অসভ্য, একটু উগ্র, কিন্তু দুঃসাহস জিনিশটা সবসময়ই দেখতে ভালো লাগে। মাত্র চারজনে মিলে তো এতজন মানুষকে ভয় পাইয়ে রেখেছে।

শহরতলী। একদিকে নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠেছে। তৈরি হচ্ছে নতুন রাস্তা। তার পাশে একটা চওড়া খাল! খালের ওপর ছবির মতন একটা কাঠের ব্রিজ, তার ওপারে ধানক্ষেত। খালপাড়ে কিছুটা জায়গা সিমেন্ট বাধানো, আশেপাশে কিছু ঘাসও পুরু হয়ে আছে। সারাদিন অসহ্য গরমের পর অনেকে ঐ জায়গাটায় বসতে আসে। দক্ষিণদিকটা বহুদূর উন্মুক্ত, তাই হু হু করে হাওয়া ছুটে আসে —বঙ্গোপসাগর থেকে একশো মাইল ছুটে এসেও সে-হাওয়া ক্লান্ত নয়, কলকাতায় এসে সে-হাওয়া একেবারে নীরস হয়ে যায়নি।

পার্ক নয়, তবু এ-অঞ্চলে বেড়াবার পক্ষে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা ঐ

খালধারের সিমেন্ট বাঁধানো পাড়, ঘাসের আসন আর কাঠের ব্রিজ। কাঠের ব্রিজের গায় হেলান দিয়ে দাঁড়ালে বাল্যকালের কথা মনে পড়ে। স্রোতে কচুরিপানার ভেসে যাওয়া দেখলে এক ধরনের বুক-মোচড়ানো উদাসীনতা আসে।

প্র্যামে বাচ্চা বসিয়ে মায়েরা এখানে একটু হাঁপ ফেলতে আসে। ছুটোছুটি করতে আসে বাচ্চার দল, ফ্রক-পরা কিশোরীরা ফড়িং ধরার জন্য দৌড়ায়। প্রেমিক-প্রেমিকার হাত মাটি থেকে ঘাস ছেঁড়ে, জলের ছায়ায় তাদের ঘন-ঘন মুখের ভাব বদলায়। দু-চারজন বৃদ্ধ কনুই চুলকোতে-চুলকোতে কথার ফোয়ারা ছোটায়। আর হাওয়া সবাইকে বারবার ছুঁয়ে যায়। সারাদিন গরমের পর এরকম মখমলের মতন মোলায়েম বাতাস ভারি বিস্ময়কর লাগে, মনে হয়, পৃথিবীতে এখন এই মুহূর্তে, যে জিনিশটা সবচেয়ে আরামের—সেটাই বিনামূল্যে এমন অপর্যাপ্ত পাওয়া যাচ্ছে কী করে?

এই দঙ্গলটার অধিপতি সেই চারজন যুবা। তাদের পোশাকের বৈশিষ্ট্য আছে, পোশাক দেখলেই বোঝা যাবে— তারা আর-সবার আলাদা। কালোরঙের খুব সরু প্যান্ট, কোমরে বেলটের বাকলসে জোড়া তলোয়ার কিংবা বাঘের মুণ্ডু মনোগ্রাম করা, লাল-কালো-সবুজে এমন অদ্ভুত বিকট কম্বিনেশানের জামাকাপড়, মিলগুলো ঐ ধরনের জামার কাপড় শুধু এইরকমের যুবাদের জন্যই তৈরি করে মনে হয়, বাঙালি হলেও এদের হাতে লোহার বালা, মাথার চুল তেল চুকচুকে এবং বিচিত্র কায়দায় আঁচড়ানো।

এই যুবক চারজন কোন-একটা জায়গায় স্থির হয়ে বসেনা, এরা টহল দিয়ে বেড়ায়। এদের দেখামাত্রই সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। প্রেমিক-প্রেমিকারাও চুপ করে গিয়ে সরে বসে, বাচ্চারা খেলা থামায়, বুড়োরা কথা বন্ধ করে।

এরা আড়ে-আড়ে চায়। বাচ্চারা হয়তো একটা বল নিয়ে খেলছে—এরা মাঝখানে এসে একটা শট দিয়ে বলটা বহুদূরে পাঠিয়ে দেয়, খলখল করে হাসে। বাচ্চাদের মায়েরা কিছু বলতে গিয়েও থেমে যান। প্রেমিক-প্রেমিকাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় এরা গলা খাঁকারি দেয়, চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওকি হচ্ছে? ওকি হচ্ছে? মাকে বলে দেব!' জলের ধারে ঝুঁকে-বসা প্রেমিক-প্রেমিকা মরা গাছের মতো কাঠ হয়ে যায় তখন। বুড়োদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ও এরা বলে, 'এই যে দাদু, একটা সিগ্রেট হবে? ছাড়ুন-না একটা।' বৃদ্ধরা থুতনি নাড়া বন্ধ করে নিথর হয়ে যান, বোঝা যায় ভিতরে-ভিতরে তাঁরা জিভ দিয়ে দাঁতের মাড়ি চেপে আছেন, দু-একজন বৃদ্ধ আবার এদের খাতির করে সিগারেট বাড়িয়েও দেন।

একদিন একজন প্রেমিক বুঝি প্রতিবাদ করেছিল। ঠিক প্রেমিক না, দুটি মেয়ের সঙ্গে তাদের দূর সম্পর্কের মাসতুতো দাদা। দূর সম্পর্কের মাসতুতো দাদাকে অর্ধেক প্রেমিক বলা যায়। সে দুটি যুবতীকে দুপাশে বসিয়ে কোন

বীররসের গল্প বলছিল, এই সময় এই চারজন যুবক পিছন থেকে আওয়াজ দেয়। সে তখন তেড়ে আসে—চেঁচিয়ে বলে, 'কী ভেবেছেন কী আপনারা? লোকে ভাইবোনদের নিয়েও বেড়াতে আসতে পারবেনা? যা খুশি তাই করবেন? কুচ্ছিৎ অসভ্য কথা এইসব ছোটি ছেলেমেয়েদের সামনে—'

তার ফলে সেই চারজন, সেই মাসতুতো দাদা প্রেমিককে চ্যাংদোলা করে তুলে জলে ফেলে দেয়। সে সাঁতার জানতনা, জলে নাকানি-চোবানি খেয়ে যখন প্রায় ডুবতে বসছিল, মেয়ে দুটি চেঁচাচ্ছিল অক্লান্তভাবে—তখন সেই চারজনই তাকে জল থেকে তুলে দিল! তার কলার ধরে দাঁড় করিয়ে বলেছিল, 'কী চাঁদু, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে? নাকি আর-একটু মধ্যমনারায়ণ লাগবে?'

প্রতিবাদ করেছিল একজন বৃদ্ধও। ওরা সিগারেট চাওয়ায় বৃদ্ধটি খেঁকিয়ে উঠে বলেছিল, 'কী, তোমার ঠাকুর্দার বয়েসী আমি, আমার কাছে সিগারেট চাইছ? কী ভেবেছ কী! হাওয়াটাকেই নোংরা করে দিলে এরা—'

এ-কথা শুনে সেই চারজন হাসতে আরম্ভ করে। বৃদ্ধ গাড়ি চেপে এসেছিলেন, ওরা হাসতে-হাসতে গাড়িব চাকার হাওয়া খুলে দিল, বৃদ্ধের ছড়িখানা পাশে পড়েছিল—সেখানা তুলে নিয়ে লোফালুফি করতে-করতে ভেঙেই ফেলল। ওদের একজন বৃদ্ধের কাছে এসে হাসতে-হাসতে ভাঙা টুকবো দুটো ফেরত দিয়ে বলল, 'সারি দাদু, ছোটি ছেলে তো আমরা—খেলা করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছি।'

আর-কেউ এখন প্রতিবাদ করে না। ওরা যখন পাশ দিয়ে যায়—সবাই বিনয়াবনত ভাবে চুপ করে থাকে। যেন সম্রাটের সামনে বাধ্য প্রজা। না, এ-উপমাটা ঠিক হলনা, এই আড়াইশো নারী-পুরুষ যেন ওদের ক্রীতদাস—স্প্যানিশ দস্যুরা যখন ক্রীতদাসের ঝাঁক নিয়ে যেত—তখন তাদের চাবুকের সামনে ক্রীতদাসরা যেমন ভয়ে নিথর হয়ে থাকত—দৃশ্যটা সেইরকম।

ঐ চারজন যুবককে আমি অপছন্দ করতে পারিনি। ওদের ঔদ্ধত্য ও অসভ্যতা সীমাহীন, কুশিক্ষা ও কুরুচির ফলে ওরা সৌন্দর্য কিংবা সম্মান—কোনটারই মূল্য জানেনা। কিন্তু ওদের দুঃসাহসও তারিফ করার মতন—বাংলাদেশে দুঃসাহসও তো খুব সুলভ দৃশ্য নয়। ওরা নিজেদের কব্জির জোরের ওপর বিশ্বাসী, ওরা বেপরোয়া, ওরা কারুকে ভয় করেনা। ওরা জেনে গেছে, এই আড়াইশো লোক কখনো একতাবদ্ধ হয়ে ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেনা। সে উপাদান এদেশে নেই। ওরা তাই জনতাকে ভয় করেনা। ওরা পুলিশ কিংবা মৃত্যুকেও ভয় করেনা। ওদেরই মতন যুবকরা তো প্রায়ই গুণ্ডামি-বদমায়েসীর অভিযোগে পুলিশে ধরা পড়ছে, জেল-ফাঁসি হচ্ছে, তবু তো ওদের স্রোত ও তেজ কমেনি, ওরা দমে যায়নি। এই দুঃসাহসটুকুর প্রশংসা করতেই হয়। এত লোকের মধ্যে ঐ চারজনই

যথার্থ শক্তিমান ও সাহসী।

কিন্তু আমার ভুল হয়েছিল। সেই ঘটনাটাই বলি। একদিন ওখানে একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে তার বাচ্চা ভাইকে নিয়ে বেড়াতে এল। মেয়েটির ফুটফুটে গায়ের রং, একমাথা কোঁকড়া চুল, শাড়ি পরার ধরন দেখলে মনে হয়, সে অল্পকিছুদিন আগেও ফ্রক পরত। মেয়েটি হাতে একটা লালরঙের বল নিয়ে লোফালুফি করছে।

সেই যুবক চারজনের দৃষ্টি মেয়েটির ওপর পড়ল। তারা পরস্পর ঠেলাঠেলি করে নিজেদের মধ্যে কীসব বলাবলি করল। মেয়েটির সঙ্গে কোন বয়স্ক অভিভাবক নেই দেখে পুলকিত হয়ে তারা চেঁচিয়ে উঠল, 'আজ নতুন জিনিশ এসেছে রে!'

মেয়েটি ওদের দিকে ভ্রূক্ষেপ করলনা। ছোটভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে হাল্কা পায়ে এগিয়ে গেল। বারবার এদিক-ওদিক পিছন ফিরে দেখছে, মেয়েটি কাকে যেন খুঁজছে। মেয়েটি ছোটভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'টুটু, গোরা কোথায় গেল? গোরা?' ভাই বলল, 'ডাকো না। তুমি ওকে ডাকো—'

মেয়েটি শূন্য উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা! গোরা! এদিকে এসো!' এই বলে মেয়েটি হাতের লাল বলটা ছুঁড়ে দিল কোনাকুনি ভাবে রাস্তার দিকে।

বলটা যেভাবে ছোঁড়া হয়েছিল—তাতে সেটা বহুদূর গড়িয়ে যেত—কিন্তু তার আগে যুবক চারটি ছুটে এসে পা দিয়ে বলটা আটকাল—হাতে তুলে নিয়ে বলল, 'বাঃ, মাইরি, বেশ বলটা তো।'

এতক্ষণ কেউ লক্ষ করেনি, পাশের অসমাপ্ত রাস্তাটার ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে গোরা প্রাকৃতিক কর্ম সারছিল। হঠাৎ এবার সে ছুটে এল। ভালো করে বোঝা যায়নি প্রথমে, উল্কার মতন প্রচণ্ডগতিতে বাঘের মতন একটা বিশাল জানোয়ার ছুটে দৌড়ে এল, এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল বল-হাতে যুবকটির উপর। না, বাঘ নয়, একটা প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান কুকুর। যুবকটি আর্ত চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল, কুকুরটা তার বুকে পা দিয়ে দাঁড়াল। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, এই গোরা! কাম হিয়ার!' সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মতন কুকুরটা বল মুখে ফিরে এল মেয়েটির কাছে। আহ্লাদে ল্যাজ নাড়তে লাগল!

যুবকটি মাটি থেকে উঠেছে, সঙ্গীরা তার পোশাকের ধুলো ঝেড়ে দিল। তারপর চারজনেই এগিয়ে এসে পা ব্যাঁকা করে দাঁড়িয়ে অষ্টাদশী মেয়েটিকে বলল, 'এই যে, শুনছেন! আপনার কুকুর মানুষকে অ্যাটাক করছে—আর-একটু হলে জানে মেরে দিত...'

মেয়েটি তার পাতলা ঠোঁট উল্টে হাসির ভঙ্গিতে বলল, 'গোরা এমনিতে

কারুকে কিছু বলেনা। আপনারা ওর বল ধরলেন কেন?'

যুবক চারজন আর-কিছু বলার আগে—অ্যালসেশিয়ানটা গম্ভীরভাবে দুবার ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। যুবক চারজন আর-কিছু বললনা।

তারপর আমি সেখানে আর আধঘণ্টা ছিলাম। সেদিন সেখানে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যেতে লাগল। যেন বহুদিন পর 'স্বার্থপর দৈত্য'র বাগানে বসন্ত এসেছে। মেয়েটি বল ছুঁড়ে-ছুঁড়ে কুকুরটিকে নিয়ে খেলা করতে লাগল—কুকুরটা ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু মেয়েটির ডাক শুনে সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে আসছে। ছোট ছেলেমেয়ের দলও সেই খেলায় যোগ দিল। আনন্দের কলরোলে খেলা জমে উঠল। সেদিন বুড়োরা নিশ্চিন্ত হয়ে বকবকানি চালিয়ে গেল, সেদিন প্রেমিক-প্রেমিকারা ঘন হয়ে বসে হাতে-হাত রাখল। একমাত্র সেই চারজন যুবকই স্থির হয়ে সেদিন বসেছে জলের ধারে। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে—কুকুরটা তাদের পাশ দিয়ে যখন ছুটে যাচ্ছে—তখন তারা আড়ষ্টভাবে চুপ।

আমি ভুল করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম ঐ আড়াইশো জনের জনতার মধ্যে ঐ চারজন যুবকই যথার্থ শক্তিমান। কিন্তু তাদের চেয়েও শক্তিমান একটা কুকুর।

১৯

আপনাদের এখান থেকে তো পাকিস্তানের বর্ডার খুব কাছে, তাই না?

—এই তো, মাইলখানেক! ঐ যে তালগাছগুলো দেখছ, ওর ওপাশেই।

—লোকজন বর্ডার পেরিয়ে যাতায়াত করেনা ?

—হরদম হরদম! পাঁচটা টাকা দিলেই দালালরা ওপারে নিয়ে গিয়ে বাসে তুলে দেয়। এপারেও সেই সিস্টেম। আর স্মাগলিংও হচ্ছে প্রচুর। হবেনাই-বা কেন, সারা বর্ডার জুড়ে তো আর পুলিশ বসিয়ে রাখতে পারেনা! পুলিশ থাকলেই-বা কী, ডানহাত বাঁহাতের ব্যাপার—

—এদিকে রিফিউজি আসেনি?

—আসেনি আবার!

হালদারমশাই চোখ ছোট করে আমার দিকে তাকালেন। তারপর ফিসফিস করে গোপন কথা বলার মতন বললেন, 'আরে ভাই, কী বলব তোমাকে! কী সুন্দর নিরিবিলি ছিল জায়গাটা আগে। এই বাঙালরা আসবার পর একেবারে ছারখার করে দিল! জায়গাটা নোংরা করেছে কী রকম, ওদের একগাদা কাচ্চাবাচ্চা,

তার ওপর আবার দল পাকানো–'

আমি একটুও দমে না-নিয়ে বললাম, 'হ্যাঁ সত্যি, বাঙালরা আসবার পর পপুলেশন এমন বেড়ে গেছে হঠাৎ এক-একটা জায়গায়।'

—শুধু পপুলেশন বেড়েছে নাকি? দ্যাখো তো পাঞ্জাবে, ওখানকার রেফুজিরা কীরকম অ্যাকটিভ! গায়ে খেটে দুদিনের মধ্যে কীরকম দাঁড়িয়ে গেছে সবাই! আর বাঙালরা, কাজকর্ম করার দিকে মন নেই, খালি বাকতাল্লা আর চেঁচামেচি! এক-একজনের আবার তেজ কী! এসেছিস আমাদের গাঁয়ে—কোথায় একটু ভদ্র হয়ে থাকবি, তা না—এইজন্যই তো বাঙালদের—

অর্থাৎ কিনা এখানকার বাঙালদের চেয়ে পাঞ্জাবের বাঙালরা অনেক ভালো!

—পাঞ্জাবের বাঙাল? হাঃ, হাঃ, হাঃ—রেফুজি মানেই বাঙাল বলছ? তা মন্দ নয়।

কথা হচ্ছিল মালদার এক গ্রামে। আমার মাঝে-মাঝে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক আছে। এদিকটায় কখনো আসিনি শুনে আমার এক বন্ধু তার কাকাকে চিঠি দিয়ে পাঠিয়েছে।

হালদারমশাই অতি সজ্জন লোক, একসময় ছোটখাটো জমিদার ছিলেন, এখন সব জমিজমা গেছে, এখন চিনির ব্যাবসা করছেন। মাঝারি অবস্থা কিন্তু অতিথি-আপ্যায়নে কোন ত্রুটি নেই। আমি ওঁর ভাইপোর বন্ধু এবং শহুরে লেখাপড়া শেখা ছেলে হয়েও গ্রামে এসেছি—আমাকে এমন বেশি খাতির করতে লাগলেন যে রীতিমতন অস্বস্তি বোধ করতে হয়। আমার স্নান করার জন্য গরম জলও দিতে চান—আমার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও।

হালদারমশাই প্রায় সারাটা জীবন গ্রামে কাটালেও এমনিতে বিশেষ গোঁড়ামি নেই। আমি ওঁর ছেলের বয়সী হওয়া সত্ত্বেও বললেন, সিগারেট-টিগারেট খাওয়া যদি অভ্যেস থাকে আমার সামনে লজ্জা কোরোনা। লজ্জা করে শুধু-শুধু দম আটকে থাকবে কেন? আমার নিজের তো একদিন বিড়ি না-হলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়না। উনি নিজে ব্রাহ্মণ কিন্তু জাতের বিচার তেমন নেই, গাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান অনেকেই তাঁকে মানে।

কিন্তু মুশকিল হল এই বাঙালদের বিষয়ে। বাঙালদের ওপর ওঁর বেশ একটা চাপা রাগ আছে। আমার কাছে এক গণ্ডা বাঙালদের নিন্দে করে ফেললেন। আমি হুঁ হাঁ দিয়ে গেলাম। হালদারমশাই আমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করেননি—ধরেই নিয়েছিলেন আমিও একজন ঘটি। এখন আমি মহাফ্যাসাদে পড়লাম। নিজে বাঙাল হয়ে অন্য বাঙালদের নিন্দে অনবরত শোনা যায়না। কিন্তু মাঝে-মাঝে আমাকে একটা অদ্ভুত ভদ্রতাবোধ পেয়ে বসে। আমার মনে হল, এখন যদি হালদার-

মশাইয়ের কাছে আমি আত্মপরিচয় দিই, তাহলে উনি দারুণ লজ্জায় পড়ে যাবেন —আমার দিকে আর তাকাতে পারবেননা। সেই লজ্জায় ওঁকে ফেলতে আমার ইচ্ছে হলনা। আবার ওঁর কথায় সায় দিয়ে গেলে মনে হবে, আমি বাঙালত্ব অস্বীকার করে ঘটিদের দলে ভিড়তে চাইছি। যদিও আমি প্রকৃত অর্থেই বাঙাল এবং রেফিউজি। আমার বাবা-ঠাকুর্দা ছিলেন পূর্ববঙ্গে—আমিও বাল্যকালে ছিলাম। এবং ওখানে আমাদের বাড়ি ছিল, এখানে এক টুকরো জমিও নেই।

হালদারমশাই আমার কাছে খুব অন্তরঙ্গভাবে গোপনে বাঙালদের নিন্দে করেছিলেন, বাড়ির বাইরে অবশ্য তিনি প্রকাশ্যে আর বাঙাল বলেননা। বলেন ইস্টবেঙ্গলের লোক। একটু রেগে গেলে রেফিউজিগুলো!

হালদারমশাইয়ের সাত-আটবছরের ছেলেকে একজন যুবক বাড়িতে পড়াতে আসে। রোগা চেহারার লাজুক ছেলেটি। সে একদিন পড়িয়ে চলে যাচ্ছে, হালদারমশাই আমাকে বললেন, 'ঐ যে ছেলেটি দেখলে, খুব ভালো ছেলে, মন দিয়ে পড়ায় রতনকে। ছেলেটি বাঙাল হলেও খুব সিনসিয়ার—পড়াশুনায় খুব আগ্রহ। বাঙালদের মধ্যে এরকম ভালো ছেলেও দুটো-একটা আছে, আই মাস্ট অ্যাডমিট—'

হালদারমশাইয়ের বয়েস প্রায় ষাটের কাছাকাছি, তাঁর মা এখনো বেঁচে আছেন। তিনি এসে হালদারমশাইকে বললেন, 'ও খোকন, দুটো বাঙাল ছোঁড়াকে ডেকে নে আয়, নারকোলগুলো পেড়ে দেবে। ওরা এমন তড়বড়িয়ে গাছে উঠতে পারে—'

হালদারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বিগলিত হাস্যে বললেন, 'লম্ফ দিয়ে গাছে ওঠে, ল্যাজ নাই কিন্তু!' আমি হাসব না কী করব বুঝতে পারলামনা।

এইরকম অবস্থা আমার আগে আরও দু-একবার হয়েছে। অন্য ধরনেরও। কফি হাউসে একবার এক মারোয়াড়ি বন্ধুর সঙ্গে বসেছিলাম। মারোয়াড়ি মাত্রেই তো আর কুটিল ব্যবসায়ী নয়। আমার সেই বন্ধুটি সেবার বি. এ. পরীক্ষায় ইংলিশ অনার্সে ফার্স্ট হয়েছিল, বেশ গরিব এবং জলের মতন বাংলা বলে। হঠাৎ আর-এক বন্ধু আমাদের টেবিলে উপস্থিত হয়েই বলা শুরু করল, 'আরে ভাই মারোয়াড়িদের জ্বালায় আর পারা গেলনা। আজ বড়বাজারে গিয়েছিলাম, এক ব্যাটা ভুঁড়ি দাস—।' আমি বন্ধুটিকে যতই চোখ টিপছি, সে কিছুতেই বোঝেনা। মারোয়াড়ি বন্ধুটি মিটিমিটি হাসতে লাগল আর বলল, 'যা বলেছেন! মারোয়াড়ির জাতটাই দেশটাকে...'

হালদারমশাইয়ের মেয়ে কলেজে পড়ে, ছুটিতে এই সময়েই গ্রামের বাড়িতে এসেছে। মেয়েটির নাম অর্চনা, নেহাত মন্দ নয় গোছের চেহারা—তবে শহরের

কলেজে পড়ে বেশ স্মার্ট হয়েছে। আমাকে দেখে অন্তঃপুরিকা হয়ে রইলনা, সপ্রতিভভাবে গল্প করতে লাগল। বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে, অর্চনাকে আমার ভালোই লাগছিল! মালদার কলেজে পড়ে অর্চনা, কলকাতা সম্পর্কে দারুণ কৌতূহল, আমাকে বারবার কলকাতার কথা জিজ্ঞেস করছে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে।

এদিকে হালদারমশাইয়ের বাঙাল ফিক্সেশন—যে-কোন কথাতেই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি বাঙালদের কথা আনবেনই। গভর্নমেন্ট তাঁর কিছু জমিজায়গা কেড়ে নিয়ে রেফিউজিদের দিয়েছে, এই হল প্রথম রাগের বিষয়। রেফিউজিদের দিতে না-হলেও যে গভর্নমেন্ট অতিরিক্ত জমি কেড়ে নিতই—সেটা ভুলে যান। বাঙালদের সম্পর্কে তাঁর আর-একটা রাগের কারণ, বাঙালরা নাকি বড্ড বেশি রগচটা, কথায়-কথায় ঝগড়া করতে আসে। আর খাইছি-শুইছি ধরনের ভাষা তাঁর দুকানের বিষ।

অর্চনা বলল, 'জানো বাবা, আমাদের ক্লাসে দুটো বাঙাল মেয়ে আছে, তাদের কথা শুনে কিন্তু একদম বোঝা যায়না। আমি তো কিছু বুঝতে পারিনি। তারপর ওরা ওদের বাড়িতে একদিন আমাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল—প্রত্যেকটা খাবারেই এত ঝাল না, উঃ, জিভ জ্বলে গিয়েছিল, তখনই বুঝলাম—! তার ওপর আবার শুটকি মাছ, আমার তো এমন বমি পেয়ে গেল...'

হালদারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও কথা শুনলে ঠিকই বোঝা যায়, যতই লুকোবার চেষ্টা করুক, বাঙালদের চিনতে...কী চেনা যায়না?'

আমি কাঁটা হয়ে বসে রইলাম। হালদারমশাই আমাকে বুঝতে পারেননি। এখন বুঝতে পারলে চোর ধরা পড়ার অবস্থা হবে। আমি আর আমার আত্মপরিচয় দেবার সুযোগ কিছুতেই পাচ্ছিনা। এমনকী একথাও আমার মনে হল, আহা ওরা নিজেদের বাড়িতে বসে নিরিবিলিতে একটু বাঙালদের নিন্দে করছে—তাতে আমি বাগড়া দিই কেন। পরনিন্দার মতন মুখরোচক জিনিশ আর নেই—ক'জনই-বা এ জিনিশ করেনা?

অর্চনা আমাকে বলল, 'আমাদের গ্রামটা ঘুরে দেখছেন সব? চলুন, নদীর পাড়টায় যাবেন?'

—নদীর পাড় খুব সুন্দর বুঝি?

—আগে খুব সুন্দর ছিল—ফাঁকা মাঠ, ঝপঝপ করে পাড় ভেঙে পড়ত—এখন আর বেশি যাইনা—এখন ওদিকটা রিফুজি কলোনি হয়েছে তো! বাঙাল ছেলেগুলো এমন প্যাট-প্যাট করে তাকায়—যেন কোনোদিন মেয়ে দেখেনি—

আমি আমার চোখে হাত বুলিয়ে বোঝার চেষ্টা করলাম, আমারও দৃষ্টি প্যাটপেটে কিনা।

হালদারমশাইকে আমি বললাম, 'কাকাবাবু, কাল তো চলে যাব, আমাকে একটু পাকিস্তানের বর্ডারটা দেখিয়ে দিন!'

তিনি বললেন, 'ও আর দেখার কী আছে? দেখে কি কিছু বোঝা যাবে?'

—তবু চলুন।

ধানক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'ঐ যে ঐ তালগাছের লাইন ওখানেই পাকিস্তানের শুরু।'

আমি চুপ।

উনি আবার বললেন, 'ঐ একটা খড়ের বাড়ি দেখছ? বাড়িটা পড়েছে পাকিস্তানে, আর উঠোনটা ইন্ডিয়ায়। হেঃ, হেঃ হেঃ—'

আমি চুপ।

—এরকম ভাগাভাগির কোন মানে হয়? সাহেবরা একটা দাগ টেনে দিল —আর অমনি দেশটা দুভাগ হয়ে গেল! আর আমাদের ন্যাতারাও সব যেমন!

আমি চুপ।

—কী হে চুপ করে আছ যে?

—এমনি, মনটা খারাপ লাগছে।

—কেন?

—এমনিই আর কী! আচ্ছা কাকাবাবু, যদি মনে করেন, পার্টিশানের দাগটা আরও দেড়-দুমাইল এদিকে পড়ত তাহলে আপনার বাড়িটাও পাকিস্তানে পড়ে যেত। আপনিও তাহলে রিফিউজি হয়ে—লোকে আপনাকে বাঙাল বলত—

—ইঃ, বললেই হল? আমার এখানে সাতপুরুষের বাস—

—ওখানেও অনেক বাঙালের—

হঠাৎ হালদারমশাই একটু চুপসে গেলেন। তারপর বিষণ্ণভাবে বললেন, 'ওরে বাবা, বুঝি, বুঝি, ঠিকই বুঝি। ভিটেমাটি ছেড়ে এতগুলো লোক এসে কত দুঃখে পড়েছে—আমাদেরই মতন তো সবকিছু—তবু মাঝে-মাঝে মনে থাকেনা। বুঝলে না, মানুষ ছোটখাটো স্বার্থ নিয়েই বেশির ভাগ সময়—তবু মনের ভেতরে—'

আমি আর-কিছু বললামনা। চুপ করে গেলাম আবার।

২০

সেই যে, একটা বাচ্চা ছেলে পড়া করতে-করতে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা, "মাই হেড" মানে কী?'—বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'মাই হেড মানে আমার মাথা', ছেলেটি তখন পড়তে শুরু করেছিল, 'মাই হেড মানে বাবার মাথা'—সেই গল্পটা আমার মনে পড়ল। এইরকম আর-একটা বহু পরিচিত গল্পও মনে পড়ল, আর-একটি খুব ছোট ছেলে পড়তে-পড়তে বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'বাবা "প্রবোধ" মানে কী?'—খবরের কাগজ পাঠরত অন্যমনস্ক বাবা উত্তর দিয়েছিলেন, 'প্রবোধ? —প্রবোধ মানে ইয়ে, মানে, প্রবোধ দেওয়া মানে সান্ত্বনা—ভালো করে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে পড়ো!' পাশের ঘর থেকে ছেলেটির মা এসে স্বামীকে বললেন, 'খবরের কাগজ পড়ে কী এমন জগৎসংসার উদ্ধার করছ! ছেলেটাকে একটু পড়াতে পারো না? হ্যা রে খোকা, প্রবোধ মানে কী বুঝলি?' ছেলেটি গম্ভীরভাবে বলল, 'প্রবোধ মানে ছোটমাসি!'

গল্পদুটি মনে পড়ায় আমি সামান্য হাসলাম।

বন্ধুর বাড়িতে বসে গল্প করছিলাম। বন্ধুর আটবছরের ছেলে টুবলু কী যেন দুষ্টুমি করেছে, নালিশ শুনে বন্ধুটি আমার সঙ্গে গল্প থামিয়ে ছেলেকে ডেকে পাঠালেন। জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, 'টুবলু এদিকে এসো!' সেই আওয়াজ শুনে টুবলু তো দূরের কথা, আমি পর্যন্ত ভয়ে কেঁপে উঠলাম। দিব্যি হাসিখুশি স্বভাবের মলয়কে কখনো এমন গর্জন করতে আগে শুনিনি। টুবলুর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল, পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল। বন্ধুটি তাঁর বিশাল একহাত রাখলেন ছেলের কাঁধে, অন্যহাত শূন্যে উত্তোলিত, টুবলুর ঠোঁট কাঁপছে, যে-কোন মুহূর্তে সে প্রবল একখানা চড় খাবার প্রতীক্ষা করছে, আমিও প্রতীক্ষা করছি।

কিন্তু আজকাল বাবারা ওরকম কর্কশ শাস্তি দেওয়া মোটেই পছন্দ করেননা। বন্ধুটি তার ছেলেকে চড় মারলেননা, শুধু কটমট করে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সেই রোষকশায়িত দৃষ্টি টুবলু বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারলনা, তার চোখ ছলছল করে উঠল, বন্ধুটি তখন তাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'আর করবে কোনদিন?' টুবলু ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'না, না'—বন্ধু তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, 'যাও, আর কোনদিন যেন এরকম না-শুনি, সবসময় ভালো হয়ে থাকবে, কক্ষনো এমনকিছু করবেনা, যাতে অন্যলোক কষ্ট পায়, যাও, পড়তে বসো—'

এইসময় আমার এ-গল্পদুটি মনে পড়ায় আমি মনে-মনে ফিক করে একটু হাসলাম। তারপর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁরে মলয়, সবসময় ভালো হয়ে থাকা মানে কী রে? টুবলু কী বুঝল?'

বন্ধু আমার দিকে ফিরে নিম্নস্বরে ইংরেজিতে বললেন, 'ছোটদের শাসন করার সময় তা নিয়ে ওদের সামনে ইয়ার্কি করতে নেই। তাতে ওরা কুশিক্ষা পায়!' —তারপর ছেলের দিকে ফিরে, 'টুবলু যাও, পাশের ঘরে গিয়ে পড়তে বসো —এখানে আমি নীলুকাকার সঙ্গে গল্প করছি, বড়দের কথা বলার সময় ছোটদের থাকতে নেই।'

টুবলু চলে যেতে, আমি বললাম, 'জানিস, একদিন বাসে একটা পকেটমার আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েছিল—'

মলয় আমার দিকে অবাক হয়ে তাকালেন। আমি বললাম, 'হ্যাঁ, এই তো গতসপ্তাহেই মৌলালির মুখটায়, একটা পকেটমার আমার পকেটে হাত ঢুকিয়েই আবার টেনে বার করে নিয়েছে, আমি টের পেয়ে গেছি, তাকিয়েছি লোকটার মুখের দিকে—লোকটার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের তাচ্ছিল্য আর হতাশা, লোকটার জন্য আমার এমন মায়া হল—'

মলয় বললেন, 'ব্যাপারটা কী, তুই কী বলতে চাইছিস?'

—ব্যাপারটা এই, আমার পকেটে টাকাকড়ি কিছু ছিল না। খুচরো পয়সাও ছিলনা। পকেট ছিল শুধু কয়েকটা বাজে ঠিকানা লেখা কাগজ মাত্র। এখন ঐ পকেটমারটা, অনেক বেছে-টেছে আমার পকেটেই হাত ঢুকিয়েছে—সেখানে লবডঙ্কা। এক বাসে তো আর দুবার পকেট মাবা যায়না, তাই লোকটা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে নেমে গেল। তখন আমার মনে হল, আহা বেচারা! ওকে শুধু-শুধু কষ্ট দিলাম। ওকে খুশি করার জন্য আমার পকেটে অন্তত কয়েকটা খুচরো টাকা অসাবধানে ফেলে রাখা উচিত ছিল। তাহলেই আমি ওর কাছে ভালো লোক হতে পারতাম। ও আমার দিকে অমন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকাতনা! তুই কি টুবলুকে এইকথাই বোঝাতে চাইছিলি?

মলয় শুকনো হেসে বললেন, 'তোর সবতাতেই চ্যাংড়ামি। সংসাবের ঝক্কি তো এখনো কাঁধে চাপেনি, তাহলে বুঝতি, আজকাল ছেলেপুলে মানুষ করা কত শক্ত।'

সে-কথায় কান না-দিয়ে আমি বললাম, 'সত্যিই 'সবসময় ভালো হয়ে থাকবি'—এ-কথার মানে টুবলু কী বুঝল সেটা খুব চিন্তার বিষয়। তুই নিজেই ভেবে দ্যাখ ভালো হওয়ার কি শেষ আছে? তোর নিজের বাবার কাছে তোকে হতে হবে আদর্শ ছেলে, আবার তোর ছেলের সামনে তোকে আদর্শ বাবা, মায়ের কাছে সুপুত্র, স্ত্রীর কাছে সুযোগ্য স্বামী, অফিসে ওপরওয়ালাকে খুশি করার জন্য নিচতলার লোকদের ধাতানি দিতে হবে, নিচতলার লোকদের খুশি করার জন্য গাইতে হবে ওপরওয়ালার কেচ্ছা, বাসকন্ডাকটারকে খুশি করার জন্য রোগা হতে

হবে, ভিখিরিকে খুশি করার জন্য পকেট ভরতি খুচরো পয়সা, পকেটমারের জন্য লুজ নোট, তুই বাড়িওয়ালা হলে ভাড়াটের সঙ্গে যে-ব্যবহার করবি, তুই ভাড়াটে হলে বাড়িওয়ালার কাছ থেকে চাইবি ঠিক উলটো ব্যবহার...অন্তত আড়াইশো রকমের উলটোপালটা আছে, এর মধ্যে'—

—আর বাজে বকবক করিসনা। এবার চুপ কর তো!

—তুই এসব কিছু ভাবিসনা, না-ভেবেই তুই ছেলেটাকে বলে দিলি সবসময় ভালো হয়ে থাকতে?

—আমি ঠিক ভাবি। তোর মতন বাজে ব্যাপার ভেবে সময় নষ্ট করিনা। পৃথিবীতে মানুষের ভালো ব্যবহারের একটা স্ট্যান্ডার্ড আছে—সেই অনুযায়ী—

—টুবল্ সেই স্ট্যান্ডার্ডের কী বুঝবে?

—ঠিকই বুঝবে, আস্তে-আস্তে বোঝাতে হবে।

এবার আমার গম্ভীর হবার পালা। আমি আস্তে-আস্তে বললাম, 'আমার কিন্তু খুব ভয় হয় একটা কথা ভেবে। আমার মনে হয় একদিন যখন এইসব ছেলেরা বড় হয়ে উঠবে, তখন তারা বুঝতে পারবে, ওদের আমরা কত মিথ্যে কথা শিখিয়েছি, আমরা ওদের তাই হতে বলেছি, যা আমরা নিজেরা বিশ্বাস করিনা, আমাদের নিজেদেরই ব্যবহারের কোন স্ট্যান্ডার্ড নেই, আমরাই সুবিধা এবং সুযোগ অনুযায়ী—'

মলয় আমাকে থামিয়ে দিয়ে মাঝপথে ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে বললেন, 'তুই এসব হঠাৎ কী করে টের পেলি? তুই কি আজকাল সোস্যাল সাইকলজি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছিস নাকি?'

আমি দুঃখের সঙ্গে বললাম, 'না, সে-বিদ্যে আমার নেই। আমি বুঝতে পারি আমার নিজের জীবন দিয়ে। আজ আমাকে তুই এরকম দেখছিস, কিন্তু আমি একসময় ভালো হবার চেষ্টা করছিলাম। আমরা অনেকেই তো গুরুজনদের উপদেশ অনুযায়ী পায়ে-পায়ে এগিয়েছি। কিন্তু কী দেখছি এখন? এখন দেখছি আমাদের অভিভাবক বা মাস্টারমশাই বা দেশ-নেতারা আমাদের যা উপদেশ দিয়েছিলেন, তাঁরা অনেকেই নিজেদের জীবনে তা অনুসরণ করেননি! আমাদের ইতিহাসের মাস্টারমশাইকে দেখেছি, তিনি গরিব লোকদের লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি কম টাকায় কিনে নেন! এই কি ইতিহাসের শিক্ষা? আমার দাদামশাইকে আমি কত মহৎ মানুষ বলে ভাবতাম, কিন্তু যেদিন জানতে পারলাম—'

—থাক থাক, ওসব কথা এখন থাক! কী সিনেমা দেখলি এর মধ্যে?

—এড়িয়ে যাচ্ছিস কেন? আমরা এইগুলো টের পেয়ে গেছি বলে আমাদের জেনারেশনে এত হতাশা, আমাদের সামনে কোন আদর্শ নেই। এসব জেনেশুনেও

আমরা চুপচাপ রয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, ঐ টুবলুরা যখন বড় হবে, তখন আর ওরা পরোয়া করবেনা! এসব উপদেশের ভণ্ডামি ওরা ধরে ফেলবে। ওরা আমাদের মুখের সামনে অবজ্ঞার সঙ্গে বলে উঠবে, 'খুব তো বড়-বড় লেকচার ঝেড়েছিলে একসময়! তোমরা নিজেরা কী, তা আমাদের জানা আছে! এখন ফোটো!'—তাই আমার মনে হয়, উপদেশ না-দিয়ে আগে থেকেই ওদের কাছে ক্ষমা চেয়ে রাখা ভালো।

—তাহলে তুই কী বলতে চাস, ছোট ছেলেদের কিছুই শেখাবার নেই আমাদের?

—আছে। শুধু, কী করে আত্মরক্ষা করা যায়, সেই যুযুৎসু!

২১

সুবিমল বলল, 'লোকটাকে আমি তিনহাজার টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলাম। ও নিতে চায়নি।'

আমি বললাম, 'তাতে কী প্রমাণ হয়? লোকটা বোকা না ভীতু না সৎ লোক?'

—সেটাই তো প্রশ্ন। আমার ধারণা লোকটা সৎ-ই ছিল, একটু ভীতুও। সৎ লোকেরা সাধারণত একটু ভীতুই হয়। কথায় বলে না, ধর্মভীরু?

—আমি তা মনে করিনা। 'ধর্মভীরু' কথাটার মানে অন্য। আমার ধারণা, অসৎ লোকেরাই ভীতু—তাদের সৎ হবার সাহস নেই। অসৎ হওয়াই সোজা।

—যাক গে ও-কথা। এখন কী করা যায়?

যে লোকটি সম্পর্কে কথা বলছিলাম, সে আমাদের সামনেই শুয়ে আছে। তার সামনে যে-কোন কথা বলা যায়, কারণ সে কানে শোনেনা, চোখেও খুব কম দেখে, তাছাড়া এখন বোধ হয় সে অজ্ঞান হয়ে গেছে!

আমি আর সুবিমল দুটো বিড়ি ধরিয়ে টানছি। অনভ্যাসে বারবার নিবে যাচ্ছে বিড়ি। একটু আগে ঐ লোকটির কাছ থেকে দুবান্ডিল বিড়ি কিনেছি। সুবিমল ওকে পাঁচটা টাকা সাহায্য হিশেবে দিতে চেয়েছিল, ও নেয়নি। ও ভিক্ষে নেবেনা। ওর বিড়ির দোকান, ও আমাদের বিড়ি কিনে সাহায্য করতে বলেছিল।

কথা বলতে-বলতে কাশতে-কাশতে লোকটি নিঝুম হয়ে পড়েছে, জ্ঞান আছে কিনা জানিনা। সুবিমল ভয়ে-ভয়ে দুবার নিচু হয়ে ডাকল, 'ইরফান, ইরফান!'

কোন সাড়া নেই। সুবিমল গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছেনা। একটা লুঙ্গি-পরা, খালি গা—শরীরটা যে একটা খাঁচা তা ওকে দেখলে বোঝা যায়—একটা হাড়ের খাঁচা ছাড়া শরীরে আর-কিছু নেই।

পাশেই একটা বেশ বড় মনোহারী দোকান—আমি সেই দোকানে গিয়ে বললাম, 'দেখুন, ঐ যে বিড়ি বিক্রি করে বুড়ো, ও হঠাৎ আমাদের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওর বাড়ির লোককে কী করে খবর দেওয়া যায়? কিংবা কাছাকাছি কোন ডাক্তার-টাক্তার—'

আমাকে শহুরে লোক বুঝেই বোধহয় দোকানদারটি একটু অপ্রসন্নভাবে তাকাল। তারপর বলল, 'ঐ ইরফান আলি তো? ওর এরকম প্রায়ই হয়—কিছু ভাবতে হবেনা, এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। বারোটার সময় ওর ছেলে আসবে—'

—একটু জল দিতে পারেন? ওর মাথায় ছিটিয়ে দিতাম—

—ঐ টিউকল থেকে নিন।

টিউবওয়েল একটা আছে বটে, কিন্তু হাতে করে তো আর জল নেওয়া যায়না! দোকানদারটির কাছ থেকে কোন পাত্রটাত্র চাইতে সাহস হচ্ছেনা। লোকটি আমার বাস্তবতাকে নিশ্চিত অদিখ্যেতা মনে করছে। আমি ওর কাছ থেকে একটা কাচের গেলাস কিনে ফেললাম। সেই গেলাসে জল নিয়ে দিলাম সুবিমলকে। সুবিমল জলের ছিটে দিতেই বুড়ো ইরফান চোখ মেলে চাইল।

মুর্শিদাবাদ শহরে অনেক খুঁজে-খুঁজে আমরা ইরফানের দোকানে এসেছি। ইরফান আগে যে-বাড়িতে থাকত, সে-বাড়ি সুবিমলের চেনা ছিল, এখন ও-বাড়িতে থাকেনা। ইরফান আগে চাকরি করত নবাব সাহেবের লাইব্রেরিতে—এখন সে-চাকরিও গেছে, বলাই বাহুল্য।

এই ধরনের লোকদের সুবিমল ঠিক খুঁজে বার করে। পুরোনো, দুষ্প্রাপ্য বই সংগ্রহ করে সুবিমল, তারপর গবেষকদের কাছে, সারা ভারতের বড়-বড় লাইব্রেরির কাছে বিক্রি করে। কোথায় কোন দুষ্প্রাপ্য বই আছে, সুবিমল তার সন্ধান রাখে, সেগুলো জোগাড় করার জন্য ও যে-কোন উপায় অবলম্বন করতে প্রস্তুত। এমনকী চুরিও। এ-সম্পর্কে সুবিমলের বিবেক খুব পরিষ্কার। ও বলে, শুয়োরের খোয়াড়ে যদি তুমি একটা মুক্তো পড়ে থাকতে দ্যাখো, তাহলে সেটা সেখান থেকে তুলে এনে কোন সুন্দরী মেয়ের আংটিতে বসিয়ে দেওয়া কি অপরাধ? কতসব, ক্ষয়িষ্ণু বনেদী পরিবারের উই-ধরা আলমারিতে দুর্লভ সব বই নষ্ট হচ্ছে, সেগুলো-যে-কোন উপায়ে গবেষকদের হাতে পৌঁছে দেওয়ায় কোন অন্যায় নেই। কথাতেই আছে ধনবানে কেনে বই, জ্ঞানবানে পড়ে।

মুর্শিদাবাদের নবাববংশেরই একটি শাখা পরিবারের আছে বহুপ্রাচীন বই ও

পুঁথির কালেকশন। তার মধ্যে আছে একটি ফারসিবইয়ের পাণ্ডুলিপি, যেটি পাবার জন্য বহু ইতিহাসের গবেষক উদগ্রীব। সুবিমল প্রথমে বইটা কেনার চেষ্টা করেছিল। সে-বাড়ির বর্তমান বংশধররা সবাই মূর্খ, বইটই সম্পর্কে কোন আগ্রহই নেই, অযত্নে অবহেলায় বইগুলো নষ্ট হচ্ছে। নানান শরিকে ঝগড়ার ফলে আদালতে মামলা চলছে কয়েকবছর ধরে, কোনকিছুই এখন বিক্রির অধিকার নেই কারুর।

সেই বাড়িতে চাকরি করত ইরফান। লাইব্রেরি ঘর ঝাড়পোছ করত—সে নিরক্ষর, সেও বইয়ের মর্ম বোঝেনা—কিন্তু যে-কাজের ভার দেওয়া হয়েছিল তার ওপর, সেটা ভালো করে করাতে চাইত। সুবিমল ইরফানের বাড়িতে দেখা করে বলেছিল, সে যদি সেই ফারসি বইখানা গোপনে সরিয়ে আনতে পারে, তাহলে একহাজার টাকা পাবে।

ইরফান মাইনে পেত মোটে ছত্রিশ টাকা। অত্যন্ত গরিব মানুষ, বাড়িতে একগাদা ছেলেপুলে। বইখানা সরিয়ে আনা তার পক্ষে খুবই সহজ ছিল, জামার তলায় পেটের কাছে গুজে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারত। দু-চারবছরের মধ্যে কিংবা কোনদিনই বোধহয় সে-বইয়ের খোঁজ কেউ করত না। সে-বাড়ির লোকেরা কোনদিন লাইব্রেরি ঘরে ঢোকেনা, ভুলেও একটা বই উল্টে দেখেনা।

কিন্তু ইরফান তবু রাজি হয়নি। এ-কাজ তার চোখে হারাম। মালিকরা বিশ্বাস করে তার ওপর যে-ভার দিয়েছে, সেই বিশ্বাস সে নষ্ট করবে কী করে।

সুবিমল বারবার এসে লোভ দেখিয়েছে ওকে। সেবার ওকে তিনহাজার টাকা পর্যন্ত দিতে চেয়েছিল, সামান্য একখানা বইয়ের জন্য। বইখানা সত্যিই মূল্যবান, তার বাজার দর এখন পাঁচ হাজার টাকার মতন—ভারতবর্ষে ঐ পাণ্ডুলিপির দুটি মাত্র কপি আছে, আর একখানা হায়দ্রাবাদে নিজামের কাছে। এ তথ্য অবশ্য শুধু গবেষকরা জানে, মুর্শিদাবাদে ঐ নবাব পরিবারের ফাকড়াবা এর খোঁজও রাখেনা।

এবার এসে ইরফানের এই অবস্থা দেখলাম। হঠাৎ চোখের অসুখ হয়ে দৃষ্টিশক্তি প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ইরফানের চাকরি গেছে। নিষ্ঠুরভাবে এককথায় বরখাস্ত—মালিকরা একটা পয়সাও অতিরিক্ত দেয়নি। মালিকরা তো আর তার সততা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অথচ স্যার যদুনাথ সরকার যখন ঐ বাড়িতে পড়াশুনো করতে এসেছিলেন, তখন ইরফান তাঁর কত সেবা করেছে। স্যার যদুনাথের সার্টিফিকেট আছে তার কাছে।

এখন ইরফানের এই সামান্য দোকান— কয়েক বান্ডিল বিড়ি, আর কাগজের প্যাকেটে কী একটা জিনিশ—শুনলাম স্বপ্নাদ্য—হাঁপানির ওষুধ। সারাদিনে এক টাকার বিক্রি হয় কিনা সন্দেহ। চোখে দেখতে পায় না, সারাক্ষণ অনবরত কাশছে,

বোঝা যায় ইরফানের মৃত্যুর আর বেশি দিন দেরি নেই।

চোখ মেলার পর সুবিমল জিজ্ঞেস করল, 'কী, এখন কী রকম লাগছে? একটু ভালো তো?'

দৃষ্টিহীন চোখে ইরফান কেঁদে ফেলল ঝরঝর করে। বলল, 'বাবু সবই আমার নসীব। তিন-তিনহাজার টাকা আপনি দিতে চেয়েছিলেন। সেই টাকা আমি পায়ে ঠেলেছি! এখন আমার ওষুধ জোটেনা, খাওয়া জোটেনা।'

—বুড়ো, তখন তো তোমায় কতবার বলেছি। ও-বই আনলে মালিকদের কোন ক্ষতি হতোনা। অন্যদের উপকার হতো অনেক। এখন আর-কোন নতুন লোককে রেখেছে?

—না, বাবু! এখন ঘর তালাবন্ধ থাকে। আদ্দিনি উইতে বোধহয় সব বই কেটে দিয়েছে।

ইস! ঐ বই যদি নষ্ট নয়, তাহলে যা ক্ষতি হবে!

ইরফান বইয়ের মর্ম বোঝে না। কিন্তু তিনহাজার টাকার জন্য কী আফসোস। তিনহাজার টাকা পেলে সে পাশের মনোহারী দোকানের মতন বড় একটা দোকান খুলতে পারত। হায়, হায়, কী যে তার বুদ্ধিভ্রম হয়েছিল! কেন যে সে তখন বাবুর কথা শোনেনি! এখন তার উচিত মাথায় কুড়ুলের কোপ দিয়ে মরা।

বেশিদিন আর বাঁচবেনা ইরফান, কিন্তু মৃত্যুর আগে সে তার সততার জন্য আফসোস করে যাচ্ছে, এ-দৃশ্যটা আমার দেখতে ভালো লাগলনা। পৃথিবীতে কত চোর-বদমাস তো বেশ মনের আনন্দে ঘুরে বেড়ায়, কোনদিন অনুতাপ করেনা। আর এই লোকটি সৎ ছিল বলে অনুতাপ করছে। শীর্ণ হাতে কপাল চাপড়াচ্ছে আর হায়-হায় করছে ইরফান।

এখানে আমাদের আর কোন দরকার নেই। আমি সুবিমলকে এবার যাওয়ার জন্য ইঙ্গিত করলাম। সুবিমল বলল, 'চলি, বুড়ো মিঞা।' ইরফান কী বলতে গিয়ে আবার ঘং-ঘং করে এমন কাশতে লাগল যে ভয় হল, আবার না অজ্ঞান হয়ে যায়। অতি কষ্টে সামলে বলল, 'আর তো আসবেননা আমার কাছে, না? আর তো কেতাব আনার ক্ষমতা নেই। তবু ফি বছর একবার আসবেন! আবার এলে দেখবেন, আমি মরে গেছি!'

বিদায় নেবার মুহূর্তটি সত্যি অস্বস্তিকর। সত্যি কথাই তো, আমরা ওর কাছে আর কেন আসব, আর তো ওকে কাজে লাগাবার কোন সম্ভাবনা নেই! সুবিমল একটা দশটাকার নোট বার করে বলল, 'এই নাও বুড়ো মিঞা, এটা দিয়ে ছেলেমেয়েদের কিছু কিনে দিয়ো।'

ছানিপড়া বিবর্ণ চোখে ও জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

—বিশেষ কিছু না। এই দশটা টাকা রাখো—দুহাত দিয়ে না করল ইরফান। বলল, 'আপনার কাছ থেকে তিনহাজারই নিইনি, আর দশ টাকা নেব? মরার পর খোদাতাল্লাকে তবু বলতে পারব, আমি কোনদিন চুরিও করিনি, ভিক্ষেও করিনি।'

না, এ-লোককে কিছুতেই ভীতু বলা যায়না।

২২

আমি আর আমার বন্ধু চৌরঙ্গীর মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি, উত্তর কি দক্ষিণ কোনদিক যাব মনঃস্থির করতে পাচ্ছি না—সেই সময় একজন মহিলা রাস্তা পার হয়ে আমাদের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে তপনকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, 'কী খবর তপন?' তপন তখন পথের অন্য মহিলাদের দেখায় ব্যস্ত ছিল, তাড়াতাড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আরেঃ রেবাদি? কেমন আছেন?'

মহিলাটি বলল, 'ভালো আছি।'

তারপর আবার তিনি বললেন, 'খুব ভালো আছি। রিজেণ্ট পার্কে একটা চমৎকার ফ্ল্যাট পেয়েছি। তোমার বউদিকে একদিন আসতে বোলো—'

তপন বলল, 'বউদি তো এখন দিল্লিতে—'

আমি একটু সরে গিয়ে অন্য দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম। তপন মহিলার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। মহিলাটির বয়স তিরিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে, বেশ সুন্দর স্বাস্থ্য, হাল্কা গোলাপি রঙা শাড়ি পরেছেন। সবচেয়ে নজরে পড়ে ওঁর কপালে আগেকার তামার পয়সার সাইজের সিঁদুরের টিপ। হ্যান্ডব্যাগটি বেশ বড়, তার মধ্য থেকে একটা বাচ্চাদের খেলার এরোপ্লেন উঁকি মারছে।

দু-তিন মিনিট তপনের সঙ্গে গল্প করে মহিলা একটি লেডিজ ট্রাম দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তপন আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে কোনদিকে যাওয়া যায়?'

আমি কোন উত্তর দিলামনা।

তপন বলল, 'তুই রেবাদিকে আগে দেখিসনি?'

—না।

—বউদির খুব বন্ধু। আগে আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন—

—না, দেখিনি—

লাল আলোর সামনে ট্রামটা তখনও দাঁড়িয়ে। ট্রামভর্তি নানা রঙের মহিলা —সেদিকে তাকানো যায় না। ট্রাম বা বাসের জানালায় একটি-দুটি মহিলাদের দেখে অনেকসময় বহুক্ষণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পুরো

গাড়িটাই মহিলাতে ভর্তি, লেডিজ ট্রামের দিকে দু-এক পলকের *বেশি চোখ রাখতে* খুবই লজ্জা লাগে।

তপনের বউদি জানালার পাশেই বসেছিলেন, ট্রাম ছাড়তে তপন আবার সেদিকে চেয়ে হাসিমুখে হাত নাড়ল। তারপর তপন আবার আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'রেবাদিকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন আছেন? উনি বললেন, ভালো আছি। বলতে পারিস, 'ভালো' কথাটার কতরকম মানে হয়?' আমি ঠোঁট উল্টে বললাম, 'কে জানে!'

—রেবাদিকে দেখে তোর কী মনে হল?

—কী আবার মনে হবে? আমি তো ভালো করে দেখিইনি!

—যা দেখেছিস তাই যথেষ্ট। ঐটুকু দেখে রেবাদি সম্পর্কে তোর কী ধারণা হল বল তো! দেখি, তোর অবজারভেশনের ক্ষমতা কী রকম! রেবাদি দুবার বলেছেন, 'ভালো আছি', সেটা খেয়াল রাখিস!

—ভদ্রমহিলা চাকরি করেন, সম্প্রতি বোধহয় প্রমোশন হয়েছে, তাই অত খুশি-খুশি মুখ। কটি সন্তান তা বলতে পারবনা, তবে একটি ছেলে আছেই—মেয়ে থাকলে এরোপ্লেন না-কিনে পুতুল কিনতেন, উচ্চারণ শুনে মনে হল ভদ্রমহিলা বি-এ. পাস, খুব সম্ভবত সংস্কৃত কিংবা ফিলসফিতে অনার্স ছিল। ভদ্রমহিলার স্বামী ইঞ্জিনীয়ার—না, না, সরকারি কর্মচারী, একটু কুঁড়ে—তবে খুব পত্নীঅনুগত, ভদ্রমহিলার শাশুড়িও একসঙ্গে থাকেন—শাশুড়ি-বউ-এর মধ্যে ঝগড়ার বদলে কে কতটা ভালো ব্যবহার করতে পারে—তার প্রতিযোগিতা চলে, ভদ্রমহিলার শখ বেড়াল পোষার—কিন্তু স্বামীর ইচ্ছে কুকুর, ইনস্টলমেন্টে রেফ্রিজারেটার কিনবেন প্রায় ঠিক করে ফেলেছেন—তপন হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'তুই আজকাল শখের গোয়েন্দাগিরি করছিস নাকি?'

আমি ঈষৎ গর্বের সুরে বললাম, 'কী, সব মেলেনি? অন্তত সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট?'

—তুই কী করে জানলি?

—মানুষ দেখে স্টাডি করার অভ্যেস করতে হয়!

তপন পুনশ্চ হাসতে-হাসতে বলল, 'খুব মানুষ চিনেছিস! একটাও মেলেনি! ঐ যে রেবাদি পর-পর দুবার 'ভালো আছি' বললেন, সেটা লক্ষ্যই করিসনি। কেউ যখন প্রশ্নের উত্তরে শুধু একবার বলে 'ভালো আছি' তাহলে হয়তো সে সত্যি ভালো নাও থাকতে পারে—সবাই তো আর দুঃখের গল্প সবসময় শোনাতে চায়না। কিন্তু দুবার ভালো আছি বললে বুঝবি পিছনে অনেককিছুই আছে, সুখ-দুঃখের একটা জটিল ইতিহাস, তার মধ্যে কোনটা বেশি কোনটা কম—সে-বিষয়ে মনঃস্থির

করা যায়না। মানুষ কতরকমে ভালো থাকে জানিস? তোরা সবসময়ে মানুষকে ছকে ফেলতে চাস। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা। রেবাদির জীবনের গল্প শুনলে স্তম্ভিত হয়ে যাবি! শুনবি?'

রেস্টুরেন্টে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলল, 'রেবাদি আমার বউদির সঙ্গে বরাবর স্কুল-কলেজে একসঙ্গে পড়েছেন, আমাদের বাড়িতে খুব আসতেন। বউদি চেষ্টা করেছিলেন, রেবাদির সঙ্গে চানুদার বিয়ের ব্যবস্থা করতে। (চানুদাকে চিনিস তো? দাদার বন্ধু দুর্গাপুরে...।) চানুদার পছন্দও হয়েছিল রেবাদিকে, কিন্তু সেই সময় রেবাদি হঠাৎ একটা প্রেম করে ফেললেন। রেবাদি নিউ সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করেন—একদিন বৃষ্টির দিনে এক ভদ্রলোক ওঁকে ট্যাক্সি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইলেন, সেই থেকে আলাপ আর প্রেম, দুমাসের মধ্যে ভদ্রলোকের সঙ্গে রেজিস্ট্রি করে বিয়ে হয়ে গেল। রেবাদির স্বামীকে দেখতে খুব সুপুরুষ, চানুদার চেয়ে অনেক ভালো ঠিকই, কিন্তু বৌদি দুঃখিত হলেন। চানুদা কত বড় চাকরি করেন, আর কী ভালো মানুষ—তার তুলনায় প্রায় একটা অচেনা-অজানা লোককে বিয়ে করা—কিন্তু প্রেম ইজ প্রেম—কে আর কী বলবে। বিয়ের পর রেবাদি আমাদের বাড়িতে আসা কমিয়ে দিলেন। একদিন আমার সঙ্গে ডালহৌসিতে দেখা—রেবাদির একগাদা গয়না গায়—দামি শাড়ি, সেদিনও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, রেবাদি কেমন আছেন? রেবাদি হাসি-হাসি মুখে বলেছিলেন, ভালো আছি ভাই (একবারই 'ভালো আছি' বলেছিলেন সেদিন, দুবার নয়), তোমার বউদিকে বোলো যাব একদিন—একদম সময়ই পাচ্ছিনা—

বউদি বলতেন, রেবা একেবারে বিয়ে করে গদগদ—ওর স্বামী নাকি ওকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে পারেনা।—সবসময় মাথায় করে রেখেছে—রেবা বাপের বাড়ি যাবার সময় পায়না।

তপন সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এরপর পর-পর চমকাবার জন্য তৈরি থাক। রেবাদির জীবনে সত্যি ঘটনাগুলোই এমন অবিশ্বাস্য যে একটুও বানাতে হয়না। ...কিছুদিন পর রেবাদিকে দেখলাম, আবার আমাদের বাড়িতে আসছেন, বউদির সঙ্গে দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ কথা বলছেন, খুব মুখ শুকনো। বউদি তখন আমাদের কিছু বলেননি, তারপর কোর্টে মামলা ওঠার পর জানতে পারলাম'—

—কোর্টে?

—হ্যাঁ। ঘটনাটা এই, রেবাদির বিয়ের আট-ন'মাস পর একদিন একজন অপরিচিত মহিলা ওঁকে টেলিফোন করেন। তিনি বলেন যে, তিনি অনেক কষ্টে রেবাদির অফিসের ঠিকানা জোগাড় করেছেন, রেবাদির সঙ্গে তাঁর দেখা করার বিশেষ দরকার—রেবাদিরই উপকারের জন্য। দেখা করে ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি

রেবাদির স্বামীর প্রথম পক্ষের স্ত্রী। রেবাদির স্বামী একজন অত্যন্ত লম্পট এবং বদমাইশ লোক। রেবাদির সাবধান হওয়া উচিত। রেবাদি বিশ্বাস করলেননা। তিনি জোর দিয়ে বললেন, না, তাঁর স্বামী খুব ভালো লোক, তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন—ভদ্রমহিলার কথার প্রমাণ কী?—ভদ্রমহিলা কী চান?

ভদ্রমহিলা বললেন, তিনি কিছুই চাননা। কিন্তু রেবাদির স্বামী ভালো ব্যবহার করেন—এটা তাঁর কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। লোকটি কি সত্যই তাহলে বদলে গেছে?

লোকটি কি দাড়ি কামাবার আগে খুর ধার দেবার জন্য স্ত্রীর পিঠে খুর ঘষে রসিকতা করেনা? লোকটি কি সারারাত বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে বাড়িতে মদ খেয়ে হল্লা করার জন্য স্ত্রীকে রান্না ঘরে শুতে বাধ্য করেনা? লোকটি কি স্ত্রীর টাকা নিয়ে মাঝে-মাঝেই চার-পাঁচদিনের জন্য বাড়ি থেকে অনুপস্থিত থাকেনা? লোকটি কি চাবুক দিয়ে কোনদিন...

ভদ্রমহিলা রেবাদির হাত চেপে ধরে বললেন, আপনি বলুন সে ভালো হয়ে গেছে, তাহলেই আমি খুশি হব। আমি তবে কিছু চাইনা, আমার কোন স্বার্থ নেই। ওর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই—একবছর আগে ওর সঙ্গে আমার সেপারেশন হয়ে গেছে।

রেবাদি তখন আর কী করবেন? ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন। তারপর অজ্ঞান হয়ে গেলেন। প্রত্যেকটি কথাই সত্যি। বিয়ের একমাস পর থেকেই লোকটি ওর থেকেও আরও ঢের বেশি অত্যাচার করেছে। রেবাদি একথা কাউকে বলতে পারেননা।—কারণ তিনি নিজেই জোর করে বিয়ে করেছেন—সেইজন্য তিনি বাইরে হাসিখুশি থাকতেন। সবার সামনে নিজেকে সুখী দেখাতে চাইতেন।

তপনের গল্প শুনতে-শুনতে আমার মনে পড়ল, ভদ্রমহিলার মুখ। বেশ উৎফুল্ল মুখে তিনি বলেছিলেন, 'ভালো আছি'। সেটা সবটাই অভিনয়? তাহলে তো তিনি কাননবালা কিংবা ইনগ্রিড বার্গমানের চেয়েও বড় অভিনেত্রী। না, সবটাই অভিনয় হতে পারেনা! কিন্তু দুবার বলেছিলেন—সে বোধহয় অন্যরকম ভালো থাকা। তপনকে জিজ্ঞেস করলাম, 'রেবাদি তখন কোর্টে মামলা করলেন?'

তপন বলল, 'শোন-না! জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকরা নভেলে যত স্টান্ট দেন—অনেক সত্যি ঘটনায় তার চেয়ে অনেক বেশি চমক থাকে। অদ্ভুত ধরনের সামাজিক গণ্ডগোল শুধু বিলেত-আমেরিকাতেই হয়না—কলকাতাতেও অহরহ ঘটছে। রেবাদি কোর্টে কেস করতে বাধ্য—কারণ লিগাল সেপারেশনের পর দুবছরের মধ্যে বিয়ে করা এদেশে বেআইনি। লোকটা তাই করেছে। কোর্টেও জজ

রায় দিলেন, বিয়েটা সম্পূর্ণ অসিদ্ধ। আইনত, লোকটির সঙ্গে রেবাদির যে-বিয়ে হয়েছে—সেটা মানা হবেনা। কিন্তু—'

তপন আমার চোখে চোখ রেখে বলল, 'কিন্তু রেবাদি তখন পাঁচ মাসের প্রেগনেন্ট। সেই অজাত শিশুটির জন্য আদালত থেকে কোন নির্দেশই দেওয়া হলনা। তাহলে সেই সন্তানটির পিতৃ-পরিচয় কী হবে? এই অবস্থায় যা স্বাভাবিক সবাই সেই পরামর্শটি দিয়েছিল রেবাদিকে, কিন্তু রেবাদি তা কিছুতেই মানতে চাইলেননা। তোর একটা অনুমান ঠিক, রেবাদির মেয়ে হয়নি ছেলেই হয়েছে, রেবাদির ছেলের বয়স এখন চারবছর—ভারি সুন্দর ছেলেটা। কিন্তু এরপর তোকে যা বলব, শুনলে তোর সত্যিই অবিশ্বাস্য মনে হবে, ভাববি হয়তো রূপকথা কিংবা আরব্যোপন্যাস—কিন্তু এর প্রতিটি বর্ণ সত্যি। আমি নিজে সাক্ষী আছি, আমি রেবাদির ছেলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। বিরাট ধুমধাম করে অন্নপ্রাশন হয়েছিল—

রেবাদির স্বামীর সেই প্রথম পক্ষের স্ত্রী, তাঁর নাম অনসূয়া, তিনি কিন্তু ঐ লোকটিকে প্রেম করে বিয়ে করেননি। তাঁর বাবা দেখেশুনেই—অমন চমৎকার চেহারার ছেলে, তখন ইনকামট্যাক্স অফিসে ভালো চাকরিও করত—ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে চাকরি গেছে—বেশ জাঁকজমক করে বিয়ে দিয়েছিলেন। অতিকষ্টে পাঁচবছর অনসূয়াদি থাকতে পেরেছিলেন স্বামীর সঙ্গে—তারপর তাঁর মন ও শরীর দুই-ই ভেঙে পড়ে। রেবাদির ছেলে হবার পর তিনি হঠাৎ এসে একদিন বললেন, 'তোমার ছেলেকে আমায় দিয়ে দাও, আমি ওকে নিয়েই থাকব। তোমার তো বয়েস কম—তোমার হয়তো আবার কারুর সঙ্গে ভাবটাব হতে পারে—কিন্তু আমার জীবনে আর কিছুই নেই, আমি ঐ ছেলেটাকে নিয়ে তবু বাঁচতে পারি।' রেবাদি ছেলেকে একেবারে দিয়ে দিতে কিছুতেই রাজি নন। অনেক লজ্জা-অপমান সত্ত্বেও তিনি ঐ ছেলেকে পৃথিবীতে এনেছেন। সুতরাং একটা অন্য ব্যবস্থা হল। অনসূয়াদি বেশ বড়লোকের মেয়ে, কিন্তু তিনি বাড়ি ছেড়ে রেবাদির সঙ্গে একসঙ্গে থাকেন এখন—ছেলেকে সবসময় দেখতে পাবার জন্য। আমি ওদের বাড়িতে গিয়েছিলাম—অনসূয়াদি আর রেবাদি অবিকল দুবোন কিংবা দুই সখীর মতো চমৎকার মিলেমিশে আছেন—খুব ভাব ওঁদের, কখনো মতের অমিল হয়না—অনসূয়াদি তাঁর বাড়ি থেকে মাসে আড়াইশো টাকা পান—রেবাদি চাকরি করেন—সুতরাং বেশ সচ্ছল সংসার ওঁদের—ছেলেটির যদিও পিতৃপরিচয় নেই—কিন্তু তাকে ওঁরা রাজপুত্রের মতন যত্নে রেখেছেন। রেবাদি সধবা সেজে থাকেন—লোকে জানে ওঁর স্বামী বিদেশে আছে। এখন ওঁরা যেভাবে আছেন—তাকেও সব মিলিয়ে বেশ ভালো থাকাই বলে—তবে দুবার 'ভালো আছি' বলার মতন ভালো থাকা, তাই না?

২৩

কোরাস গান শুনতে-শুনতে একটা গলাই সাধারণত প্রধান হয়ে কানে আসে। বোঝা যায় দশ-বারো জন গাইছে, কিন্তু একটা গলা তার মধ্যে আলাদা, বেশি সুরেলা বেশি জোরালো, অন্যরা যখন পরের লাইনটা গাইবে কিংবা আগের লাইন রিপিট করবে—এই নিয়ে দ্বিধা করে, তখন সেই একটি গলা গানটাকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তাকিয়ে থাকলে কিন্তু বোঝা যায়না, কোরাসের গায়ক-গায়িকাদের সেই আলাদা গলাটা কার। মানুষের চেহারা দেখে আর যাই বোঝা যাক গানের গলা কিছুতেই অনুমান করা যায়না। তবু আমি উৎসুক চোখে সেই মেয়েটিকে খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। আমার ইচ্ছে ছিল মেয়েটিকে ধন্যবাদ জানানোর। যাত্রা সুগম হচ্ছিল ওর জন্য। কিন্তু খুঁজে পাইনি, ধন্যবাদ জানানো হয়নি।

উত্তরবঙ্গের সরকারি বাস, ছেড়েছে মনুমেন্টের কাছ থেকে, সকালবেলা। শীত চলে গেছে, অথচ গরম পড়েনি—এমন সুন্দর সময়। বাসে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশজন যাত্রীর মধ্যে যদি আঠারো-কুড়িজন একবয়েসী মেয়ে থাকে, যদি তারা একই কলেজের, একই ক্লাসের ছাত্রী হয়, তবে তারাই সে আবহাওয়া অধিকার করে থাকবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। বেথুন বা ভিক্টোরিয়া বা ব্রেবোর্ন কলেজের ছাত্রীরা এক্সকারশানে চলেছে।

প্যাসেজের দুপাশে সীট, বাঁদিকের সীটগুলো সবই নিয়েছে ঐ মেয়েরা, ডানপাশে অন্য যাত্রীরা, আমি জায়গা পেয়েছি একেবারে শেষের দিকে, ঝাঁকুনি-এলাকায়। এ ঝাঁকুনিতে খবরের কাগজ পড়া যায়না, বেশিক্ষণ জানালা দিয়ে প্রকৃতি দেখতেও ভালো লাগেনা। ঐ মেয়েরা মিউজিক্যাল চেয়ার খেলার মতন ঘন-ঘন পরস্পর জায়গা বদল করছিল, যে-যার বেশি সখী সে বসছিল তার পাশে, চাপা রসিকতা, সম্মিলিত হাসি। হঠাৎ শুরু হল কোরাস গান।

আগে থেকে গান গাইবে ঠিক করেনি, রিহার্সাল দিয়ে আসেনি, সুতরাং তাদের মধ্যে, নিশ্চয়ই তাদের মধ্যে একজন কেউ, প্রথম তুলেছিল গানের প্রস্তাব, সেই শুরু করেছিল এবং তার গলাই গানের গতি নিয়ন্ত্রণ করছিল। সে কে, আমি দেখিনি। যারা গাইছিল, তাদের প্রায় সবারই সুরেলা গলা—তবু একজনের গলা সবাইকে ছাড়িয়ে যায়।

আজকাল সব মেয়েই রবীন্দ্রসংগীত গায়, সবাই মোটামুটি নির্ভুল গায়, এইজন্য অধিকাংশ সময়ই রবীন্দ্রসংগীত শুনতে ভালো লাগেনা, একঘেয়ে মনে হয় আমার। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথের আড়াই হাজার গানের মধ্যে পঁচিশ-তিরিশখানা

গানই সবাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গায়। কিন্তু চলতি বাসে, একটু উঁচু স্কেলে উৎসাহভরা সতেজ গলায় বারো-চোদ্দজন মেয়ের গান, তার চার্ম আলাদা। মাঝে-মাঝে একটু-আধটু সুর-ছুট, লাইন ভুলে গিয়ে সবাই মিলে দমকা হাসি—এসবই সেই গানের সার্থকতার অঙ্গ।

মন দিয়ে শুনছিলাম। পথ এগিয়ে যাচ্ছে তরতর করে, দূরত্বের বিরক্তি টের পাচ্ছিনা। মেয়েগুলির রবীন্দ্রসংগীতের স্টক কম নয়, একটা শেষ হলেই থেমে যাচ্ছেনা, কেউ জিজ্ঞেস করছেনা, তুই এটা জানিস? একজন কেউ ধরছে অন্য গানের প্রথম লাইন, আর কয়েকজন ঠিক গলা মিলিয়ে গেয়ে উঠছে।

চা খাবার জন্য বাস থামল। মেয়েরা তখনও গানের ঝোঁকে আছে, নেমে ঘুরতে লাগল সাবলীলভাবে, প্রায় সবাই সুশ্রী ও স্বচ্ছন্দ। হুড়োহুড়ি করে চা-সিঙ্গাড়া খেয়ে বাসে উঠল, বাস চলা শুরু করতেই ওদের গান আবার শুরু হলো! লক্ষ করলাম যে-কয়েকটি মেয়ে টকাস-টকাস করে ইংরেজিতে কথা বলছিল, তারাও রবীন্দ্রসংগীত জানে।

বেলা বেড়েছে, প্রত্যেক যাত্রীই নিজেদের সীট গরম করে ফেলেছে, কেটে গেছে আড়ষ্টতা, সবাই নিজেদের হাত-পা ও ব্যক্তিত্ব ছড়াবার জন্য উসখুস করছে। সামনে ডানদিকের সীটগুলোতে বসেছে সেই জাতের কয়েকজন লোক, যারা টাকা দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ কিনে ফেলতে চায়। তবে নিজেদের গাড়িতে না-গিয়ে সরকারি বাসে চেপে যাচ্ছে কেন তারা, সেটা একটা সমস্যা। হয়তো নতুনত্বের জন্য। তাদের একজন গলা খাকারি দিয়ে বলল, 'আপলোগ হিন্দী গানা জানেননা? থোড়া হিন্দী গানা করুন-না!'

হিন্দী গান সম্পর্কে আপত্তি করার কিছুই নেই। এক-একটা ব্যাপার সম্পর্কে এমন একটা স্তর এসে যায়, যখন আর আপত্তি করার কোন মানে হয়না। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সস্তা কুরুচিপূর্ণ হিন্দী গান গেয়ে উচ্ছন্নে যাচ্ছে—এরকম একটা অভিযোগ কিছুদিন আগেও অনেকের মনে ছিল। কিন্তু এখন প্রতি পাড়ায় হিন্দী সিনেমায় বরাবর ভিড়, রেডিওতে বিবিধভারতীর সারাদিন চিৎকার, প্রতি পূজা প্যান্ডেলে হিন্দী গানের কান ফাটানো আওয়াজের পর এখন আর আপত্তি জানানো অর্থহীন! মশা, মাছি ধুলোর মতন বাংলাদেশে হিন্দী সিনেমার গান মেনে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পিকনিকে, চলতি বাসে সবরকম গানই চলতে পারে। পিকনিক-টিকনিকে গেয়ে আনন্দ করার মতন হালকা জমাট গান বাংলাতে বেশি নেই।

কিন্তু রবীন্দ্রসংগীত থামিয়ে হিন্দী গান গাইতে বললে বাঙালির সেন্টিমেন্টে এখনও সুড়সুড়ি লাগে। কারুর শালিকের ডাক শুনতে ভালো লাগে বলেই দোয়েল

পাখিকে শালিকের মতন গান গাইতে বলার কোন মানে হয়না। আমি ব্যাপারটা পছন্দ করলাম না। অবশ্য, আমি বসে আছি একেবারে শেষদিকে, আমার আপত্তি করার কোন প্রশ্ন ওঠেনা। মনে পড়ল আর-একটা ঘটনা, একবার ট্রেনে চেপে ওয়ালটেয়ার যাচ্ছিলাম, দুজন বাচ্চা ভিখিরি কায়দায় পাথরের টুকরো বাজিয়ে চমৎকার গান করছিল। গানের ভাষা বুঝিনি এক বর্ণ, তামিল বা তেলুগু হয়তো, কিন্তু ভারি সুন্দর দুলকিচালের সুর। বাচ্চাদুটোকে দাঁড় করিয়ে গান শুনছিলাম, পাশে বসা দুজন কাপড়-ব্যবসায়ী একসময় বলে উঠেছিল, এই, হিন্দী গানা নেহি জানতে হো? বাচ্চাদুটো তখন নিজস্ব গান থামিয়ে অক্ষম বেসুরো গলায় হিন্দী সিনেমার দুখানা চলতি গান গাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। হিন্দী গানের অনুরোধে আমি চটিনি, কিন্তু ভিখিরি দুজন যখন পয়সা চাইল, কাপড়ের ব্যবসায়ী দুজন তখন হাত গুটিয়ে মুখ ফিরিয়ে রইল, আমি ঈষৎ ঝাঁঝালোভাবে বললাম, ওদের গান গাইতে বললেন, আর পয়সা দিলেননা? ব্যবসায়ী দুজন বাঁকাভাবে উত্তর দিল, কাকে ভিক্ষে দেব-না-দেব, তাও কি আপনার কাছে জেনে নিতে হবে নাকি? আমি মনে-মনে বলেছিলাম, আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাবে! একটু রাত্তির হতেই কাপড়ের ব্যবসায়ী দুজন যখন ঘুমে ঢলতে লাগল, আমি সিগারেটের আগুনে তাদের কাপড় পুড়িয়ে গোল-গোল গর্ত করে দিতে লাগলাম। এমন কিছু অন্যায় করিনি, কাপড়ের ব্যবসায়ী তো ওরা, একটা কাপড় নষ্ট হলে আর কী যাবে-আসবে!

এখন অবশ্য ঐ ধরনের কাণ্ড কম করি। চুপচাপ বসে লক্ষ্য করে যেতে লাগলাম শুধু। মেয়েগুলো বোধহয় অনুরোধ শুনতে পায়নি, গান গেয়েই চলেছে। আবার তারা, টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সব সুখ কিনতে চায়, একটু বিগলিতভাবে বলল, 'ইয়ে, শুনিয়ে, আপ লোগ বহুৎ আচ্ছা গানা করেন, লেকিন একটো হিন্দী গান যদি শুনায়ে দেন—'

মেয়েগুলো থামল, ভ্রূভঙ্গি করল, হেসে উঠল কলস্বরে। আবার একটা রবীন্দ্রসংগীত শুরু করল।

টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সব সুখ কিনতে চায়, তারা একটু দমে গেল। কিন্তু নিরাশ হলনা। হিন্দী গান শোনার ইচ্ছে তখন তাদের প্রবল। এবার তারা অস্ত্র বার করল।

সুটকেস থেকে বেরুলো ট্রানজিসটার রেডিও। নব ঘোরাতেই ঝনঝন করে উঠল হিন্দী সিনেমার গান। তীব্র, ধাতব, শ্রিল। মেয়েগুলি একমুহূর্তের জন্য থামল, তারপরই আবার দ্বিগুণ জোরে গাইতে লাগল। সুরের জগতে এক লণ্ডভণ্ড কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সম্পূর্ণ দুরকম গান মারামারি করতে লাগল বাসের মধ্যে। মেয়েরা গাইছে 'ওগো, নদী আপন বেগে পাগল পারা, আমি স্তব্ধ চাপার তরু...' আর

ট্রানজিস্টার গাইছে, 'তুম বিন যাউ কাঁহা!...' প্রতিযোগিতায় মেয়েরাই জিতছে, তারা ঢেকে দিচ্ছে ট্রানজিস্টারের আওয়াজ, কিন্তু তারা একটু দম নিতে থামলেই ফুঁড়ে উঠছে সেই ধাতব সুর! মেয়েরা পরের গান ধরল আরও তালের, আরও দ্রুত লয়ে 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে, কে জানে!' আর ট্রানজিস্টারও ধরল ডুয়েট, 'শাওন কি মহিনে, পবন কিয়ে তোড়ো (আরে বাবা, তোড়ো নেহি, তো—ড়ো, তো—ড়ো)।'

টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সব সুখ কিনতে চায় তারা একটু হেরে গেলেও নিবৃত্ত হলনা। এবার তারা আরও দুটো ট্রানজিস্টার বার করল। তিনটেতেই টপ স্পীডে চালাল একই হিন্দী গান। এবার আর মেয়েরা পারবে কেন? তিনজন লতা মুঙ্গেশকারের সঙ্গে কি আর বারো-চোদ্দজন কলেজের মেয়ে পারে? তাদের গলা ছাপিয়ে ট্রানজিস্টারের সরু আওয়াজ সারা বাসে ক্যান-ক্যান করতে লাগল।

এবার মেয়েরা একটু থামল, তারপর তারা অন্য পন্থা ধরল। দেখা গেল, তারা হিন্দী গানও ভালো জানে, জানবেই, স্বাভাবিক। রবীন্দ্রসংগীত থামিয়ে ট্রানজিস্টারকে হারাবার জন্য, ওতে যে হিন্দী গান হচ্ছিল, তারাও সেটাই গাইতে লাগল। তখন আর গানটা বড় কথা নয়, ট্রানজিস্টারকে হারানোই যেন প্রধান। একমুহূর্ত থামছেনা তারা, গানের ফাঁকে-ফাঁকে যে-বিজ্ঞাপন অন্ধকারে পথ দেখাবে অমুক ব্যাটারি কিংবা 'সত্যিকারের কফির স্বাদ অমুক কফিতেও' তা-ও গাইতে ছাড়বেনা।

গান ছেড়ে চেঁচামেচিটাই প্রধান হয়ে পড়ায় একটুবাদেই তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ল। তারা চুপ করল, ট্রানজিস্টার চেঁচাতে লাগল অবিশ্রান্তভাবে। কোরাসে যে-মেয়েটির গলা প্রধান শোনা যাচ্ছিল, তার পরাজয়ের জন্যই আমি একটু দুঃখ বোধ করছিলাম।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে একটি মেয়ে বলল, 'ঐ ট্রানজিস্টারটা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর, না রে?'

টাকা দিয়ে যারা পৃথিবীর সুখ কিনতে চায়, তারা তা পেয়ে অত্যন্ত তৃপ্ত এখন। গদগদভাবে মেয়েটির উদ্দেশে বলল, 'দেখবেন? নিন-না।'

মেয়েরা তারপর থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে ট্রানজিস্টারে হিন্দী গান শুনতে লাগল। ভাব হয়ে গেল ডানপাশের লোকদের সঙ্গে।

২৪

এমনিতে আমার কোন চোখের দোষ নেই, কিন্তু মাঝে-মাঝে লোকে আমাকে ট্যারা বলে। মাঝে-মাঝে অর্থাৎ আমার চোখের দিকে কেউ চোখ রেখে তাকালে কোন খুঁত পাবেনা, বেশ গোল-গোল নিরীহ ধরনের চোখ, চোখের মণি যেখানে থাকার কথা সেইখানেই থাকে, ট্যারা বলে চেনার কোন উপায় নেই। কিন্তু মাঝে-মাঝে, একটু অমনোযোগী হলেই আমার চোখের তারাদুটো পাশের দিকে অদ্ভুতভাবে বেঁকে যায়, ঘাড়টাও একটু কাৎ হয়ে আসে। কোন অদ্ভুত বা বিস্ময়কর ব্যাপার দেখে যে আমার চোখ ট্যারা হয়ে যায়, তা কিন্তু নয়, যে-কোন সময়েই এরকম হতে পারে। অর্থাৎ আমার সামনে হয়তো কোন রূপসী যুবতী, কিন্তু আমার মুখ দেখলে মনে হবে, আমি তখন দেয়ালের পোস্টার পড়ছি মন দিয়ে। কিংবা রাস্তা পার হবার সময় পাশ দিয়ে ছুটে আসা ভয়ংকর ট্রাকটিকে লক্ষ্য করছি মনোযোগ দিয়ে, কিন্তু লোকের ধারণা, আমি নাকি তখন রাস্তার ওপারের কোন গজেন্দ্রগামিনীর দিকে তাকিয়ে বিমোহিত হয়ে আছি। অনেকসময় পাশের কোন লোক আমার হাত চেপে ধরে আর্তকণ্ঠে সাবধান করেছেন, 'কী করছেন! মরবেন নাকি' কী অর্থে তাঁরা মরার কথা বলেন, আমি বুঝতেই পারিনা।

মোট কথা, আমার চোখের তারার এইরকম খেয়ালী পাগলামি নিয়ে আমি ছেলেবেলা থেকেই মনঃকষ্টে আছি। বন্ধুবান্ধবরা সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, ও কিছু নয়, তুই একটু লক্ষ্মীট্যারা! লক্ষ্মীট্যারা কথাটা শুনতে খারাপ নয়, ওটা আমার খুব অপছন্দ নয়, কিন্তু অচেনা লোকেরা ভাবে, ওরকম করা আমার বদমাইসী! কেননা, ট্যারা লোকদের চোখ দেখলেই বোঝা যায়, আমার চোখ দেখে কিছুই বোঝার উপায় নেই, আমার চোখ দেখে বড়জোর কেউ বলতে পারে গোরুর মতন ড্যাবডেবে কিংবা ইঁদুরের মতন কুচো-কুচো কিংবা ভেড়ার মতন বোকা-বোকা (আকালে নিভৃতে যে-দু-একজন একেবারেই প্রশংসা করেনি, তাও অবশ্য নয়) —কিন্তু ট্যারা কেউ বলবেনা। কিন্তু সম্পূর্ণ আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেই, মাঝে-মাঝে হঠাৎ আমার চোখের তারা দুটো কোণের দিকে চলে যায়, ঘাড়টা বেঁকে যায়, তখন আমার কিছুই খেয়াল থাকেনা, কিন্তু অন্য লোকে ভাবে আমি টেরিয়ে তাকাচ্ছি। হয়তো গভীর মনোযোগ দিয়ে সিনেমা দেখছি, হঠাৎ অন্ধকারে পাশের দম্পতির কাছ থেকে কথা ভেসে আসে আমার উদ্দেশ্যে, লোকটা কী অসভ্য, সিনেমা না-দেখে আমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে! আমি লজ্জিত হয়ে চমকে সোজা হয়ে বসি, ওঁদের তো বোঝানো যায়না যে, আমার ঘাড়টা ওঁদের দিকে বেঁকে গেলেও চোখের মণি দুটো আছে সিনেমার পর্দাতেই! একথা মুখে বলা

যায়না, সেইসঙ্গে অবশ্য একথাও বুঝতে পারিনা, ওঁরাই-বা সিনেমার পর্দার দিকে না-তাকিয়ে আমার দিকে তাকালেন কেন! অথবা কোন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হয়তো আমাকে কোন উপদেশ দিচ্ছেন, আমি খুবই আন্তরিকভাবে শুনছি, হঠাৎ তিনি ধমকে উঠলেন, কী, কথা গ্রাহ্যই হচ্ছেনা! অন্যদিকে তাকিয়ে থাকা হচ্ছে!—কলেজে পড়ার সময় যে এইরকম বকুনি কত খেয়েছি। বিনাদোষে আমার এই বকুনি খাওয়া।

আমার এই দোষের কারণ সম্পর্কে অনেক খোঁজাখুঁজি করেছি। ডাক্তাররা কিছু বলতে পারেননা। আমার বাড়িতে একটা কথা শুনেছি, জানিনা সেটা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য। শুনেছি, আমার জন্মের পর, আমার যিনি ধাত্রী বা ধাইমা ছিলেন, তিনি ছিলেন ট্যারা। জন্মের পর বেশ কয়েকবছর আমি তাঁর কোলেই মানুষ হয়েছি এবং আমি তাঁর মতন নকল করে তাকাবার চেষ্টা করতাম। ছেলেবেলা সেই ট্যারা ধাইমাকে নকল করা থেকেই নাকি আমার এই সাময়িক ট্যারা-দৃষ্টির অভ্যেস হয়ে গেছে। অনেক শিশু যেমন লম্বা কবিতা আবৃত্তি করে কিংবা দাঁত ওঠার আগেই রবীন্দ্রসংগীত গেয়ে কিংবা ভালো করে দাঁড়াতে শেখার আগেই টুইস্ট নেচে কিংবা বেড়ালের ইংরেজি বলতে পেরে প্রতিভার স্ফুরণ ঘটায় ও বাপ-মায়ের মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত করে, আমারও তেমনি প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল—তিনবছর বয়েসেই আমি ট্যারা ধাইমার নকল করতে পারতাম, অবিকল তার মতন তাকাতে পারতাম লোকজনের অনুরোধে, সবাই তাই দেখে হাততালি দিতেন।

কিন্তু ছেলেবেলায় যা ছিল আমার প্রতিভার প্রকাশ, এখন সেই জিনিশই আমার প্রতিভার সমস্ত পথ আটকে রেখেছে। সোজাভাবে দেখতে না-পারা, সামনে তাকিয়ে পাশের জিনিশ দেখা, কিংবা পাশে তাকিয়ে সামনে দেখা—এই গোলমালই মনে হয়, আমার সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। সে-কথা যাকগে, আমার এই সাময়িক ট্যারাত্ব কাটাবার আমি বহু চেষ্টা করেছি, পারিনি, একটু অন্যমনস্ক হলেই দেখেছি—সব ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার। সুতরাং ভেবেছিলাম, চোখ দুটোকে ঢেকে রাখলে কেমন হয়। অর্থাৎ চশমা। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার এমনই প্রবল যে, হাজার চেষ্টা করেও চশমা নিতে পারিনি। চোখ দুটো আমার যতই দেখতে খারাপ হোক, আমার দৃষ্টিশক্তি সত্যিই খুব জোরালো। রাস্তায় বাস আসতে দেরি হলে শ্যামবাজারে দাঁড়িয়ে বন্ধুবান্ধবরা আমাকে অনুরোধ করে দ্যাখ তো, বালিগঞ্জ থেকে বাস ছাড়ল কিনা!—রামায়ণের যুগে জন্মালে আমার ধারণা, হনুমানের দরকার হতোনা, কন্যাকুমারিকায় দাঁড়িয়েই আমি অনায়াসে লঙ্কার অশোকবনে বন্দিনী সীতাকে দেখতে পেতাম। সুতরাং চোখের ডাক্তারের কাছে আমার কোন সুবিধে হয়নি, উল্টোপাল্টা এ বি সি ডি চার্টের একেবারে নিচে লেখা প্রিন্টেড অ্যাট

ক্যালকাটা—তাও পড়ে দিয়েছিলাম বলে তিনি চোখ রাঙিয়ে আমাকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন, যাতে আর কোনদিন তাঁর মূল্যবান সময় আমি নষ্ট না-করি!

হঠাৎ একদিন একটা সুযোগ এসে গেল। একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, আমার মায়ের কাছে একজন বেশ বুড়ি মতন মহিলা বসে আছেন। বেশ পুষ্ট চেহারার বিধবা, নির্ভেজাল বাঙাল ভাষায় ঘর ভর্তি করে রেখেছেন। মা বললেন, একে চিনতে পারিস! এ হচ্ছে বিলুর মা, এ তোকে ছেলেবেলায় মানুষ করেছিল। শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই সেই, এই সেই আমার ছেলেবেলার ধাত্রী? আমার ওঁকে চিনতে পারার কথা নয়। আমি ওঁকে দেখছি অন্তত পঁচিশ বছর বাদে। জন্মেছিলাম পূর্ববাংলার এক গ্রামে, সেই গ্রামের, মাটির কথা এখনো মনে আছে, কিন্তু মানুষজন সব আবছা হয়ে গেছে।

শুনলাম, আমার ধাত্রী, অর্থাৎ, বিলুর মা, পাকিস্তান হবার পরও পূর্ববাংলায় ছিলেন, বছর পাঁচেক আগে মাত্র রিফিউজি হয়ে এসেছেন, আছেন রানাঘাটের এক কলোনিতে। সত্তরের বেশি বয়েস, শরীর এখনো ভাঙেনি, কিন্তু চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে প্রায়, চোখে প্রায় কিছুই দেখতে পাননা।

চোখ দুটো নষ্ট হয়ে গেছে শুনে আমি দমে গেলাম। ওর কথা শোনা মাত্রই আমার মনে হয়েছিল ওঁর ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে একবার মিলিয়ে নিতে হবে তো! ছেলেবেলার সেইসব কথা সত্যি কিনা! কিংবা ওঁর চোখের সামনে যদি আবার নকল করা শুরু করি, তবে এবার উল্টো ফলও হতে পারে এখন, আমার দোষ কেটে যেতে পারে। কিন্তু বিলুর মা এখন অন্ধ। ওঁর চোখের দিকে তাকিয়ে এখন আমার চোখ কী দেখবে?

বিলুর মা এসেছেন সাহায্য চাইতে। বাচ্চা নাতির হাত ধরে, খোঁজ করতে-করতে এসেছেন আমাদের বাড়িতে। মা একটা কাপড় আর কয়েকটা টাকা দিয়ে দায় মেটালেন।

বিলুর মা আমাকে একেবারে আদরে-আদরে অস্থির করে তুললেন। আমার গায়েমাথায় হাত বুলিয়ে বিস্ময়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'সেই দুধের বাচ্চা এখন এত বড় হয়ে গেছে? অ্যাঁ? এ যে ডাঙর জোয়ান! অ্যাঁ? আমার বুকের দুধ খাইয়েছি ওকে, সেই দুধের শিশু আজ এত বড়? অ্যাঁ?' আমি খানিকটা অভিভূত হয়ে পড়ছিলাম বটে, কিন্তু একজন শহুরে আধুনিক যুবকের পক্ষে এইরকম নোংরা কাপড়-পরা বুড়ির হাত ছোঁয়া আদরে যতখানি অস্বস্তি প্রকাশ করা উচিত, তাও করছিলাম।

বিলুর মা আমাকে একটা অনুরোধ করে বসলেন। বললেন, 'তোদের এত চেনাশুনো, আমার চোখের একটু চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতে পারিস? গত

পাঁচবছর ধরে চোখের এই অবস্থা। কলকাতা শহরে এলাম, অথচ কলকাতা শহর যে কী জিনিশ, চোখ মেলে দেখতে পারলামনা। ও আমার সোনা, ও আমার মণি, একটু ব্যবস্থা করে দিবি? বড় ইচ্ছে করে মরার আগে একবার চোখ মেলে দেখে যাই। দিবি?'

এই বৃদ্ধা সম্পর্কে কোন স্মৃতিই আমার মনে নেই, একেবারেই অচেনা লাগছে। কিন্তু, ওঁর বুকের দুধ খেয়েছিলাম—সেই কথা শুনে আমার বুকের মধ্যে একবার মুচড়ে উঠল। চোখের চিকিৎসা করা কি সহজ কথা? কত টাকা খরচ হবে, কোথায় কী ব্যবস্থা করতে হবে কিছু জানিনা, তবু মুখে না উচ্চারণ করতে পারলামনা, বললাম, 'আচ্ছা, আমি ব্যবস্থা করে দেব, তোমার চোখ ভালো হয়ে যাবে!' বিলুর মা আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করতে লাগলেন।

কোথায় আমার নিজের চোখ ভালো করার কথা, তার বদলে যাঁর কাছ থেকে আমি চোখ-ট্যারা রোগ পেয়েছি, তাঁর চোখ ভলো করার চেষ্টাতেই আমাকে ব্যস্ত হতে হল। বিলুর মা মাঝে-মাঝেই নাতির হাত ধরে আমাদের বাড়ি আসা শুরু করলেন। আমিও বন্ধুর মামা, কলিগের কাকা, প্রতিবেশীর শ্বশুর—ইত্যাদিদের ধরাধরি করে এক চোখের হাসপাতালে সীট জোগাড় করে ফেললাম, প্রায় বিনাপয়সাতেই বিলুর মার চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ওঁর স্বাস্থ্য তখনো ভালো, চিকিৎসায় সুফলের আশাও পাওয়া গেল। প্রথমে ডাক্তাররা ওব দাতগুলো তুলে ফেললেন, মুখখানা তো ফোকলা হয়ে চুপসে গেল, তারপর চোখ অপারেশন হবে!

সেই সময় বিশেষ কাজে আমাকে যেতে হয় উড়িষ্যায়। মাসখানেক বাদে ফিরলাম, যথারীতি এই মাসখানেক আমার অন্যান্য বিষয় নিয়ে এত কিছু ভাবাব ছিল যে, বিলুর মার বিষয়ে ভাবার সময় পাইনি। হঠাৎ একদিন বিলুব মা-কে আমাদের বাড়িতে দেখলাম। বুড়ি নিস্পলক এক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, অন্য চোখটি তুলোর প্যাড দিয়ে ঢাকা। অপারেশন সার্থক হয়নি, আগে তিনি দুটি চোখেই সামান্য ঝাপসা দেখতে পেতেন, একটা চোখ অপারেশন করার পর সে-চোখটা একেবারে অন্ধ হয়ে যায়। বাকি চোখটা ডাক্তাবরা আর অপারেশন করতে ভরসা পাননি। দয়াবশত ডাক্তাররা ওঁর অন্ধ চোখটায় একটা পাথরেব চোখ বসিয়ে দিয়েছেন। সেই পাথরের চোখ নিস্পলক।

বাকি চোখটা থেকে তুলোর প্যাড সরিয়ে অতিশয় ঝাপসাভাবে তাকিয়ে বুড়ি বললেন, 'আমার আর কলকাতা শহর দেখা হলনা। তাতে কী! তুই তো চেষ্টা করিছিলি! বেঁচে থাকো, সুখে থাকো, রাজা হও, মানিক আমার, আহা, সেই দুধের ছেলে আজ কত বড়, আহা'—বুড়ির ঝাপসা চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল।

খেয়াল করিনি, কখন আমার চোখের মণি দুটো কোণের দিকে সরে গেছে, ঘাড় বেঁকে গেছে। আমি অন্য দিকে তাকিয়ে আছি, আমারও চোখে জল এল হঠাৎ। এখনো সেই অনুকরণ! বুড়ির চোখের জল দেখে আমার অমনি চোখের জল!

২৫

কলেজ স্ট্রিটের রেলিং-দোকান থেকে একটা বই কিনে ফেললাম। অনেক দরাদরি করেও ষাট পয়সার কমে নামাতে পারলামনা, একটা আধুলি ও দশ পয়সার বিনিময়ে বইটি আমার হস্তগত হল।

বইটার আসল দামই বারোআনা। কিন্তু আমি অনেকক্ষণ ধরে বইটা নাড়াচাড়া করছিলাম বলে দোকানদার আমার উৎসাহ টের পেয়ে গিয়েছে। বইটার মলাট ছেঁড়া, পাতাগুলো হলদে আর মুড়মুড়ে, ছাপা হয়েছে আঠারোশ' একাশি সালে।

বইটার নাম মাধব ও ললিতা, লেখকের নাম নিত্যানন্দ শাস্ত্রী। এ-বইয়ের নাম আমি আগে কখনো শুনিনি। গবেষক-টবেষক হবার মতন বিদ্যে আমার নেই, পুরোনো বইয়ের সাল-তারিখ আর ইতিহাস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা আমার স্বভাব নয়। তবে মাঝে-মাঝে জীবনটা একঘেয়ে লাগলে দু-একটা বেশ পুরোনো ধরনের বই পড়ে খানিকটা মুখ বদলাতে ভালো লাগে। সে-বইয়ের সাহিত্যমূল্যের জন্যে নয়—পুরোনো কালের আবহাওয়া, মানুষের স্বভাব-চরিত্রের কথা বেশ আকর্ষণ করে।

কিন্তু এ-বইটা আমি কিনলাম আর-একটি কারণে। বইটাতে বহুকাল আগের বিবর্ণ কালিতে নানারকম মন্তব্য লেখা আছে—সেগুলো থেকেও আর-একটা কাহিনীর আভাস ফুটে ওঠে। আগেকার দিনে গয়নার বাক্সে যেমন একটা বাক্সের মধ্যে আর-একটা বাক্স থাকত—এটাও সেরকম, উপন্যাসের মধ্যে উপন্যাস।

বইখানা একটা গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী। এই বইখানা যে সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পায়নি, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। ভাষা খুবই দুর্বল, বঙ্কিমবাবুর ব্যর্থ অনুকরণ। কিন্তু উননব্বই বছর আগে প্রকাশিত বই তো আর সাহিত্য-সমালোচকের মন দিয়ে পড়া যায়না। কাঁচা-কাঁচা ভাষায় সেকালের জীবনের কথা পড়তে বেশ ভালোই লাগে, ঘটনাগুলো সত্যিই মনে হয়। লেখক নিত্যানন্দ শাস্ত্রীমশাই স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও সেকালের পক্ষে রীতিমতন সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। বামুনের ছেলে আর তাঁতির মেয়ের প্রেম।

পরম শাস্ত্রজ্ঞ বংশের ছেলে মাধবকুমার ছেলেবেলা থেকেই খুব দুরন্ত ; নদীর পারে, শ্মশানে, সে একা-একা ঘুরে বেড়ায়, তাঁতি-জেলে-কামার-কুমোরদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। তাঁতির বাড়ির মেয়ে ললিতার সঙ্গে সে খেলা করে, ঝগড়া করে —দুজনের বয়েস তখন যথাক্রমে এগারো ও নয়। তারপর মাধবকুমারকে পাঠানো হল বারাণসীতে—কিন্তু সেখানে গিয়ে শাস্ত্রপাঠে তার মন বসেনা, সর্বক্ষণ মনে পড়ে ললিতার কথা 'বারাণসীর গঙ্গার তরঙ্গেও সে শুনিতে পায় ললিতার হাস্যধ্বনি। এই গঙ্গাই তো তাহাদের গ্রামের পার্শ্ব দিয়া বাহিয়া যাইতেছে।'

যাইহোক, মাধবকুমার তো একদিন খুব পণ্ডিত হয়ে অনেক টাকাপয়সা উপার্জন করে গ্রামে ফিরে এল—কিন্তু ততদিনে ললিতার বিয়ে হয়ে গেছে এবং বিধবা হয়েছে। মাধবকুমার তখন যেদিকে তাকায় সেদিকেই শ্মশান দেখে। কোন শাস্ত্রই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারেনা! সমাজের এইসব বন্ধন যারা সৃষ্টি করেছে, তাদের উদ্দেশ্যে অভিশাপ দিতে ইচ্ছে হয়!

লেখক এই পর্যন্ত খুব সাহস দেখিয়েছেন অবশ্য। কিন্তু সেসময় বিদ্যাসাগর মশাই বিধবাবিবাহ আইন পাশ করালেও মাধব আর ললিতার বিয়ে দিতে সাহস পাননি! কারণ, তখন বিধবা বিয়ে হলেও—ব্রাহ্মণী বিধবার সঙ্গেই ব্রাহ্মণের ছেলের বিয়ে হতো। লেখক শেষপর্যন্ত ললিতাকে খ্রিস্টানী করে দিলেন, সে চলে গেল আসামে—আর মাধবকুমার বিবাগী হয়ে গেল। শেষের দিকে খুব একটা দার্শনিক তত্ত্ব দেওয়া আছে।

এই তো গেল আসল বইয়ের গল্প। বইখানা আঠারোশ' বিরাশি সালে একজন কেউ কিনে আর-একজনকে উপহার দিয়েছিল। একজন পুরুষ যে একজন নারীকে উপহার দিয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেন সন্দেহ নেই, তা পরে বলছি। শুধু লেখা আছে হে-কে বি। অর্থাৎ হে-নাম্নী কারুকে উপহার দিয়েছেন বি। রবীন্দ্রনাথও হে-নাম্নী নারীকে তাঁর বই উৎসর্গ করেছিলেন। এখানে 'হে' হয়তো হেমাঙ্গিনী বা হেমনলিনী বা হেমপ্রভা—এর থেকে বেশি আধুনিক নাম তখনকার পক্ষে ভাবা যায়না! আর 'বি' নিশ্চয়ই বিনোদবিহারী বা বিশ্বনাথ বা বিশ্বেশ্বর। বিকাশকান্তি বা বিভাসকুমার যদি হয় তো খুবই আধুনিক বলতে হবে! যাইহোক, আমি নারীটির নাম মনে-মনে বেছে নিলাম হেমপ্রভা এবং পুরুষটি বিশ্বেশ্বর!

উপহারের তলায় পুরুষ হস্তাক্ষরে লেখা, 'এই বইটি শুধু তুমিই পড়িবে। ইহা শুধু তোমার একার।' একথা লেখার মানে কী? বই কি কখনো একার জন্য হয়! তাছাড়া 'মাধব ও ললিতা' এমন কিছু একটা আহামরি বই নয়, কবিতার বইও নয় যে সেটাকে যত্ন করে লুকিয়ে রাখতে হবে।

আমি গোয়েন্দাগিরি শুরু করলাম। প্রথমেই লক্ষ করলাম, টাইটল পেজের এক কোণে লেখা আছে, 'পৃষ্ঠা ৯৭'। বইটি মোট দেড়শো পাতা, তাহলে ৯৭ পৃষ্ঠাটির বিশেষত্ব কী? খুললাম। ৯৭ পৃষ্ঠায় পাঁচ-ছটি লাইনের তলায় লাল কালির দাগ দেওয়া! মার্জিনে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'লেখকরা যাদুকর!' লাইনগুলি এই :

'কোন বাক্য বিনিময় হইল না! মাধব ললিতার দিকে কয়েক পলক নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল। ললিতা তখন অলিন্দে একটি রক্তবর্ণ ভিজা শাড়ি মেলিতেছিল, মাধবের দিকে চাহিয়াই চক্ষু নামাইয়া লইল, আবার চাহিল। সেই দু-এক পলকেই বহু কথা নিঃশব্দে উড়িয়া গেল বাতাসে—সেই কথা শুধু হৃদয় হইতে হৃদয়ে পৌঁছায়। আশ্বিন মাসের সেই সকালটি অনন্ত মুহূর্ত হইয়া দাগিয়া রহিল মাধবের বুকে।'

ও হরি, এটা আসলে একটা অভিনব প্রেমপত্র। আমাদের এই বিশ্বেশ্বরবাবু ১৮৮৫ সালে হেমপ্রভাকে চিঠি লেখার বদলে বইয়ের কয়েকটা লাইনে দাগ দিয়ে পাঠিয়েছিলেন! নিশ্চয়ই কোন আশ্বিনের সকালে তিনি হেমপ্রভাকে দেখেছিলেন লাল শাড়ি শুকোতে দিতে। চোখাচোখিও হয়েছিল—এবং দৈবাৎ এই বইতে সেরকম বর্ণনা পেয়ে চিঠির বদলে বইটাই দিয়েছিলেন। নিশ্চয়ই দুজনের জাতের মিল ছিলনা। তবে অতকাল আগে হেমপ্রভা বই পড়তে জানতেন—এটা বেশ আশ্চর্যের ব্যাপার, ব্রাহ্ম মেয়ে ছিলেন বোধহয়।

আরও আছে। হেমপ্রভা শুধু পড়তে জানতেননা লিখতেও পারতেন। মুক্তোর মতন ঝকঝকে হাতের লেখা। বইয়ের একেবারে শেষে। সাদা পাতায় স্পষ্ট মেয়েলি হাতের লেখা রয়েছে কয়েক লাইন। নিশ্চয়ই হেমপ্রভার লেখা। সম্ভবত বইটি তিনি বিশ্বেশ্বরকে ফেরত দিয়েছিলেন। চিঠি চালাচালির বদলে বই আদানপ্রদান অনেক সুবিধেজনক, অন্তত সেকালে ছিল! হেমপ্রভা লিখেছেন :

'না, পুরুষ লেখকরা নারীর অন্তরের সমস্ত দুঃখ বেদনার কথা সম্যক বুঝিতে পারেনা। মাধব যেদিন উন্মাদের মতন ললিতার পিতার গৃহে ছুটিয়া আসিয়াছিল, সেদিন ললিতা তাহার দরজা খোলে নাই, ঘরের বাহির হয় নাই। মাধব তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী ভাবিয়া ফিরিয়া গেল। ছাই বুঝিয়াছ লেখক! তাহার কলমের মুখে চুনকালি! জানে না যে প্রাণের বিনিময়েও নারী তাহার দয়িতের সম্মান নষ্ট হইতে দেয়না। আমি শত দুঃখ সহিতে পারি—দুঃখ সহার ক্ষমতা নারীর জন্মগত—কিন্তু তোমাকে কোনো দুঃখ বা অসম্মান ভোগ করিতে দিবনা!'

বাঃ, হেমপ্রভার কলমের তো বেশ ধার ছিল! অনায়াসেই লেখিকা হতে পারতেন। বোঝাই যাচ্ছে বিশ্বেশ্বরবাবু একদিন দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে হেমপ্রভাদের বাড়িতে এসেছিলেন—সেদিন হেমপ্রভা তাঁর সঙ্গে দেখা করেননি।

সেই কি শেষ দেখা? শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল ওদের! সেটা আর জানা গেলনা। ৫৫ পৃষ্ঠাতেও দুটি লাইনের তলায় দাগদেওয়া। সেটা ওদের দুজনের মধ্যে কে দাগ দিয়েছে ঠিক নেই। 'একবার ভাবিল মরিব। পরক্ষণেই আবার ভাবিল, না। মরিলে তো আর ও মুখ ধ্যান করিতে পারিবনা!'

বয়েসের হিশেব করলে বিশ্বেশ্বর আর হেমপ্রভা আমার ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার চেয়েও বয়েসে বড়। এতদিন তাদের বেঁচে থাকার কথা নয়। তবু তাদের যৌবন কালের প্রণয়ের সৌরভ আমাকে ছুঁয়ে গেল। এরকম বইখানা ওদের কোন বংশধর সের দরে বেচে দিয়েছে! কী খেয়াল হল, বইটার শেষে আমি লিখলাম, 'হে মাধব ও ললিতা, হে বিশ্বেশ্বর ও হেমপ্রভা, স্বর্গে কি তোমাদের দেখা হয়েছে? অমরলোকে কি মিলন হয়েছে, মিটেছে অতৃপ্ত বাসনা? ভালোবাসার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝিটাই বড় সাংঘাতিক। আশা করি স্বর্গে ভুল বোঝাবুঝি নেই! জাতিভেদও নেই সেখানে।'

লেখকরা লেখে ভবিষ্যৎকালের পাঠকদের জন্য, আমি লিখলাম অতীতকালের উদ্দেশ্যে।

২৬

এখন মেয়েদের যে গোল চশমা বেরিয়েছে, সেগুলো আমার পছন্দ হয়না। মস্ত বড় গোল-গোল ফ্রেমের সানগ্লাস আজকাল পথেঘাটে অনেকমেয়ের চোখে দেখতে পাই, সেগুলো দেখলেই আমার নাক কুঁচকে যায়।

স্বপ্না বলল, 'ওরকম বিশ্রীভাবে তাকিয়ে আছেন কেন?'

আমি বললাম, 'কী করব বলো! আমার মুখখানাই যে বিশ্রী দেখতে। আমি তো আর চেষ্টা করলেও সুন্দর হতে পারিনা! কিন্তু তোমার মুখখানা তো সুন্দর, তুমি অমন বিচ্ছিরি চেহারা করেছ কেন মুখের?'

—কোথায়, বিচ্ছিরিটা আবার কোথায় দেখলেন?

—ঐ যে চোখে বিকট গোল সানগ্লাস পরেছ! খুলে ফ্যালো!

—এই চশমাটা বিচ্ছিরি! এটাই হচ্ছে লেটেস্ট গো-গো ব্যাপার। আপনার কোন টেস্ট নেই!

—এটা শুধু আমার টেস্টের ব্যাপার নয়। পৃথিবীর যাবতীয় কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীদের টেস্টের ঠিক উল্টো! চিরকাল টানা-টানা চোখ বলতেই সুন্দর চোখ বুঝিয়েছে, যেমন পটল-চেরা চোখ কিংবা নদীর বাঁকের মতন ভুরু! তার বদলে

ভুরু-টুরু সব ঢেকে একি বিশ্রী চশমা! কথাতেই বলে গোল-গোল চোখ মানেই বোকা-বোকা ব্যাপার, কিংবা শাকচুন্নীরা চোখ গোল-গোল করে তাকায়। ছবিতে দ্যাখনি, যত ভূত কিংবা শাকচুন্নী, আঁকা হয় সবারই চোখ গোল? আর তোমরা ইচ্ছে করে...

—যান যান, আপনি তো ভারি বোঝেন! আজকাল অন্যসব স্মার্ট ছেলেরা এইরকম সানগ্লাসই পছন্দ করে।

—আমি অবশ্য তেমন স্মার্ট নই। তবে ডুবে-ডুবে জল খেতে জানি ঠিকই, বুঝলে! আজকালকার ছেলেরা মেয়েদের খুব ভয় করে—মুখের ওপর একদম নিন্দে করতে পারেনা, মেয়েদের যা দেখে তাই প্রশংসা করে। কিন্তু ছেলেরা যখন আলাদাভাবে নিজেদেব মধ্যে গল্প করে, তখন তোমাদের সম্পর্কে যা বলে, তা যদি কখনো শুনতে—

—কী বলে, কী বলে, বলুন-না!

—ইস্, বলব কেন? ছেলেদের গোপন কথা তোমাদের জানিয়ে দেব কেন?

—যান বলতে হবেনা। আমরাও নিজেদের মধ্যে গল্প করার সময় ছেলেদের সম্পর্কে কী বলি, তাও আপনাকে বলবনা!

—সে তুমি না-বললেও আমি জানি।

—কী করে জানবেন? মেয়েরা কক্ষনো সেসব কথা ছেলেদের সামনে বলবেনা!

—না-বললেই-বা। লেখকরা তবু সব জেনে যায়। লেখকরা অন্তর্যামীর ছোট ভাই কিনা।

—আহা—হা, ভারি তো লেখক আপনি! সম্পাদকদের খোসামোদ করে-করে একটা-দুটো লেখা ছাপান! তাও কেউ পড়েনা!

—এই স্বপ্না, বাজে কথা বলবেনা! আচ্ছা দ্যাখো, মেয়েরা নিজেদের মধ্যে ছেলেদের সম্পর্কে কী রকম আলোচনা করে। আমি সব বলে দিচ্ছি! দ্যাখো, মেলে কিনা!

স্বপ্না পা থেকে চটিটা একবার খুলে আবার পরল। টেবিলের ওপর ছড়ানো আঁচলটা গুছিয়ে পিঠে রাখল, কালো চশমাটা খুলে ঝকঝকে চোখে তাকাল, একটা আঙুল থুতনিতে কায়দা করে ছুঁইয়ে বলল, 'বলুন, শুনি!'

আমি সিগারেট ধরিয়ে বললাম, 'মনে করো, তুমি আর গায়ত্রী হাজরা মোড় দিয়ে আসছিলে, এমন সময় বরুণ সরকারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! তোমরা দুজনেই আগে বরুণকে দেখেছ, কিন্তু তোমরা ওকে ডাকলেনা—তুমি গায়ত্রীকে বললে, ঐ ছেলেটাকে দ্যাখ, পাশ থেকে বরুণের মতন দেখতে। গায়ত্রী বলল,

মতন আবার কী, ও তো বরুণই! (তুমিও সেটা ভালোই জানো!) তুমি বললে, ও বোধহয় অমলের বাড়িতে গিয়েছিল—অমল তো এইদিকেই থাকে! গায়ত্রী বললে, তাই নাকি, অমলের বাড়ি বুঝি এখানে?

(গায়ত্রীও খুব ভালোভাবেই জানে যে অমলের বাড়ি মনোহরপুকুরে!) তারপর বরুণ ঠিক যেই তোমাদের দিকে তাকিয়েছে, অমনি তোমরা একটা হিন্দী সিনেমার পোস্টার খুব মন দিয়ে দেখতে লাগলে।

বরুণ তখন কাছে এগিয়ে এসে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল, এদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

তোমরা উদাসীনভাবে বললে, এখানেই আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলাম! আপনি বুঝি এদিকেই থাকেন?

বরুণ হেসে বলল, না, আমিও আমার এক বন্ধুর বাড়িতেই যাচ্ছিলাম। যাক, আর যাবনা!

তোমাদের দুজনেরই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছিল, কোন বন্ধুর বাড়ি? অমলের? কেননা তোমাদের দুজনেরই অমল সম্পর্কে বেশ ইন্টারেস্ট আছে! অমল দারুণ ব্রাইট ছেলে। যাইহোক, তোমরা মুখে সে-কথা বললেনা। গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, কেন, যাবেননা কেন?

বরুণ একটা মনোমতো কথা বলার সুযোগ পেয়ে গেল! সে পল নিউম্যানের মতন কাধ ঝাঁকিয়ে বলল, আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—এখন আর বন্ধুর বাড়িতে কে যায়! আপনারা এখন কোথায় যাবেন?

এরপর বরুণ অতি ব্যস্ততায় বেশ কয়েকটা উল্টোপাল্টা কথা বলে ফেলল। সে বলল যে, তোমরা যদি গড়িয়াহাটার দিকে যাও, তাহলে ও পৌঁছে দিতে পারে ওর গাড়িতে—ওদিকে ওর একটা দরকার আছে। তোমরা সেদিকে যেতে চাও না শুনে ও তোমাদের পার্ক স্ট্রিটে নিয়ে যাবার প্রস্তাব দিলে—ওখানে আরেক কোন বন্ধুর সঙ্গে ওর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, একটা রেস্তোরাঁয়—তোমরা গেলে ও খুবই খুশি হবে।

গায়ত্রী সে-প্রস্তাবেও রাজি হলনা। যদিও পার্ক স্ট্রিট যাবার খুব অনিচ্ছা ছিলনা, কিন্তু ওর ধারণা প্রস্তাবটা দেবার সময় ও শুধু স্বপ্নার দিকে তাকিয়েই বলছিল। আর স্বপ্নাও রাজি হলনা। যদিও অনিচ্ছা ছিলনা তারও, কিন্তু সে ভাবল, আহা, অনাসময় তো ছন্দাকে দেখলেই বরুণ একেবারে গদগদ হয়ে পড়ে। আর এখন—।

খানিকটা নিরাশ হয়ে গেলেও বরুণ হাল ছাড়লনা। আরও কিছুক্ষণ ঝুলোঝুলি করল, আর তোমরা দুজনেই খুব হাসতে-হাসতে ওকে প্রত্যাখ্যান করলে। তারপর

বরুণ তোমাদের কোকাকোলা খাইয়ে বিদায় নিল—তোমরা দুজনেই লক্ষ রাখলে, ও অমলের বাড়ি যায় কিনা। কারণ, বরুণ যদি তোমাদের অমলের বাড়ি নিয়ে যাবার কথা বলত, তোমরা তক্ষুণি রাজি হতে।

বরুণ চলে যাবার পর, গায়ত্রী বলল, শুধু-শুধু অনেকটা, দেরি হয়ে গেল!

তুমি বললে, সত্যিই, মা আজ বলেছিল, তাড়াতাড়ি ফিরতে। আসলে, তোমাদের দুজনের কারুরই বরুণের সঙ্গে কথা বলতে এবং ওর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে খারাপ লাগেনি। বরুণ যদি আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তোমাদের কাছে কাকুতি-মিনতি করত, তাও তোমরা বিরক্ত হতে না। ছেলেদের অনুরোধ কিংবা আবেদন উপেক্ষা করতে মেয়েরা খুব ভালোবাসে। আবার ছেলেরা সবসময় নানা অনুরোধ না-করলেও মেয়েরা চটে যায়।

যাইহোক, একটুক্ষণ তোমরা দুজনেই অন্যকথা বলার পর, গায়ত্রী বলল, বরুণ, ছেলেটা কিন্তু এমনিতে বেশ স্মার্ট, না-রে?

তুমি তখন বললে, হ্যাঁ, কাঁধ দুটো বেশ চওড়া। ক্রিকেট খেলে তো—

অর্থাৎ, গায়ত্রী বরুণের দুটো প্রশংসা করার পর তুমিও দুটো প্রশংসা করলে! তারপর যখন তোমার মনে হল, গায়ত্রী একটু বেশি বেশি প্রশংসা করছে, তখন তুমি বললে, তবে যাই বলিস, ওর হাসিটা একটু ক্যাবলা-ক্যাবলা।

(বরুণের ধারণা, তাকে পল নিউম্যানের মতন দেখতে।)

গায়ত্রী তখন বলল, তাকানোটাও কীরকম কীরকম যেন! মাঝে-মাঝে বড্ড ন্যাকা হয়ে যায়!

অর্থাৎ ওর দুটো নিন্দে করার পর গায়ত্রীও দুটো নিন্দে করে ফেলল। এবং কী করে যেন অমলের সঙ্গে ওর একটা তুলনা এসেই গেল। আর অমলের তুলনায় বরুণ যে কিছুইনা—'

স্বপ্না অনেকক্ষণ ধরেই আমার কথায় ফুলে-ফুলে হাসছিল, এবার হো-হো করে হেসে বলল, 'একদম গল্প! কিছু মেলেনা। মেয়েরা কক্ষনো এরকম করে কথা বলেনা। আপনারা কিছু জানেননা, শোনেননা, শুধু বানিয়ে-বানিয়ে লেখেন।'

আমি বললাম, 'মেয়েদের আর-একটা দুর্বলতা এই, তারা নিজেদের সম্পর্কে সত্যি কথা শুনলে একদম মানতে চায়না! যাক গে, এবার শোনো, ছেলেরা যখন নিজেরা শুধু থাকে, তখন কী রকম কথা বলে।'

—থাক, সে আর বলতে হবেনা। সে আমাদের ভালোই জানা আছে। ছেলেরা খুব অসভ্য হয়।

—সব ছেলেই অসভ্য? তুমিও কিছু জানোনা। তোমাকে একটা সত্যি কথা

বলি, ছেলেরা যখন শুধু নিজেরা থাকে, তখন মেয়েদের কথা একদম বলেইনা! তাদের নিজস্ব কত কথা আছে, রাজনীতি, স্পোর্টস, দেশের অবস্থা, শিল্প-সাহিত্য —এইসব, মেয়েদের কথা বলে সময় নষ্ট করতে যাবে কেন?

—থামুন, থামুন! ঢের জানা আছে! সব হ্যাংলা এক-একটা—

—সত্যি বলেছি, ছেলেরা নিজেদের মধ্যে মেয়েদের কথা একদম বলেনা। গোপন রাখে। যদি-বা বলে, তাও এলিজাবেথ টেলর কিংবা ইন্দিরা গান্ধী কিংবা ভার্জিনিয়া উলফ—এইসব বিখ্যাত নারীদের কথা—অথবা রাস্তায় সম্পূর্ণ কোন অচেনা মেয়ে দেখলে তার সম্পর্কে—কিন্তু নিজেদের চেনা মেয়েদের সম্পর্কে কোন কথাই বলে না কখনো। নেহাত দু-চারটে বোকা ছেলে আছে অবশ্য, তারা ছাড়া—

—আপনি নিজেকে খুব চালাক ভাবেন, না?

—আর-একটা কথা শোনো। ছেলেদের বান্ধবীরা যখন খুব সাজগোজ করে আসে, লেটেস্ট ফ্যাশান নিয়ে আলোচনা করে—তখন তারা একটা খুশির ভাব দেখায় বটে, কিন্তু মনে-মনে তারা অন্য একটি মেয়ের স্বপ্ন দেখে। প্রত্যেক ছেলেই সেইরকম একটি মেয়েকে ভালোবাসতে চায়—যে মোটামুটি সুন্দরী তো হবে নিশ্চয়ই, কিন্তু যার মধ্যে কোন ন্যাকামি থাকবেনা, যে কখনো শাড়ি-গয়নার জন্যে লোভ করবেনা, যে ছেলেদের সঙ্গে সবরকম অবস্থায় মানিয়ে নিতে পারবে, যদি কখনো দুঃখ-কষ্ট আসে, রোদ-ঝড়-জলেও সেই মেয়েটি হাসিমুখে তার পাশে থাকবে—আবার আনন্দ কিংবা সুখের সময়েও—। অবশ্য এরকম মেয়ের দেখা সে কখনো পাবেনা, তাও জানে। তোমরা মেয়েরা নানারকম শাড়ি-গয়নার ডিজাইন আর গোল কালো চশমা আর লেটেস্ট হেয়ার ডু করে, পুরুষদের ভোলাতে চাইছ, অথচ পুরুষরা মনে-মনে ভালোবাসে একটি নিরাভরণ, নিরভিমান সুন্দরী মেয়েকে।

স্বপ্না দর্পের সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'হ্যাঁ, বেশ করব, এই গোল চশমা পরব। আপনাদের পছন্দে-অপছন্দে আমাদের কিছু যায়-আসেনা।'

———